অম্বিকাচরণ মজুমদার

(জীবনী)

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী, এম, এ,
প্রণীত

ও

"ভারতবর্ষ" সম্পাদক
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের
ভূমিকা সম্বলিত।

সংহতি পাব্লিশিং হাউস
৭নং মুরলীধর সেন লেন,
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
৭নং মুরলীধর সেন লেন,
কলিকাতা

১ম সংস্করণ—১৩৪৮
মূল্য পাঁচসিকা

প্রিন্টার
শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
অজন্তা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
কলিকাতা।

শ্রদ্ধেয় কবিবন্ধু

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

শ্রীকরকমলে

ভূমিকা

গত প্রায় ৬০ বৎসরের বাঙ্গালার রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেশের বহু বৈশিষ্ট্যই আমাদের চোখে পড়ে। তাহার একটির কথাই এখানে বলিব। জেলার বড় সহরের বড় বড় উকীলরা ঐ সময়ের মধ্যে কিরূপ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের জীবনী আলোচনা না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন, মৈমনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ, ঢাকার আনন্দচন্দ্র রায়, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত, যশোহরের রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার, বহরমপুরের রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন প্রভৃতির নাম কাহার অপরিচিত? কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় এই যে, একদিকে যেমন বাঙ্গালার গত ৬৫ বৎসরের রাজনীতিক আন্দোলনের সম্পূর্ণ কোন ইতিহাস নাই, অন্যদিকে তেমনই যাঁহারা এই রাজনীতিক আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কোন জীবনী নাই। রাজসাহীর শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী বা দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এখনও জীবিত। খুলনার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ও এখনও রাজনীতিক আন্দোলন চালাইতেছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ সকল নেতার জীবনীর বহু উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। এ বিষয়ে বাঙ্গালী উদ্যোগী না হইলে

আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ ইতিহাস সম্বন্ধে কি শুধু কল্পনাই করিবেন।

আমরা আনন্দিত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া এইরূপ একজন মহাপুরুষের জীবনী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। তিনি ফরিদপুরের স্বর্গত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়। মজুমদার মহাশয়ের জীবনের বিশিষ্টতা—উপরে যাঁহাদের নাম করিয়াছি, তাহাদের সকলের হইতে পৃথক। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজধানী কলিকাতায় বাস করিয়া বড় হইয়াছিলেন। আনন্দমোহন বসু মৈমনসিংহের অধিবাসী হইলেও কলিকাতা তাঁহার কর্ম্মস্থান ছিল। অম্বিকাচরণ কিন্তু ফরিদপুরেই বাস করিতেন এবং ফরিদপুরই তাঁহার কর্ম্ম ও অর্থার্জ্জনের ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু মফঃস্বল সহরে বাস করিয়াও তিনি সুরেন্দ্রনাথ বা আনন্দমোহনের মত বিরাটত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই মত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সে যুগে বহু কৃতী বাঙ্গালী এই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই বাঙ্গালার মফঃস্বল সহরে বাস করিতেন না।

গত ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় গ্রামে ও মফঃস্বলে ফিরিয়া যাওয়ার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল—কিন্তু এই সকল নেতারা মফঃস্বলে বাসের প্রয়োজনীয়তা তাহার বহু পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ ফরিদপুরের জেলা আদালতে ওকালতী না করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিলে কত অধিক টাকা উপার্জ্জন করিতেন, সে কথা আমরা আলোচনা করিব না। তিনি

ফরিদপুরের আদালতে ওকালতী করিয়াই যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন ও তাহার সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা অম্বিকাচরণের জীবনী পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়।

আজ বাঙ্গালার এই অবনতি ও দুর্গতির কথা চিন্তা করিবার সময় বার বার তাই এই সকল মনীষীদের কথা মনে পড়ে। তাঁহাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ছিল সেগুলি হারাইয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এত দুর্দ্দশা। অম্বিকাচরণের জীবনী যদি একজন বিপথগামীকেও এই দুর্দ্দিনে পথ দেখাইতে পারে, তবেই জীবনী লেখকের উদ্দেশ্য ও শ্রম সার্থক হইবে।

লেখকের লেখনী সার্থকতা লাভ করুক, ইহাই একান্তমনে কামনা করি।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ — শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রবীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

কংগ্রেস ও বাংলা

এরূপ ধরণের বাংলার রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পুস্তক আর একটীও নাই।

মূল্য দেড় টাকা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত

স্রোতের টানে

নূতন ধরণের সামাজিক উপন্যাস। মূল্য দুই টাকা।

নরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত

ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র

শরৎবাবুর ব্রহ্ম-প্রবাসকালের নিখুঁত চিত্র।

মূল্য পাঁচ সিকে।

কবি অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

সায়ন্তনী

প্রিয়জনকে উপহার দিবার উপযোগী কবিতার বই। এন্টিক কাগজে ছাপা। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

আধুনিকী

নূতন ধরণের প্রহসন। মূল্য আট আনা।

সংহতি পাব্লিশিং হাউস

৭নং মুরলীধর সেন লেন,

কলিকাতা।

অম্বিকাচরণ মজুমদার

অম্বিকাচরণ মজুমদার

বংশ-পরিচয়

ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত সেনদিয়া গ্রামে * বৈদ্যবংশে অম্বিকাচরণের জন্ম হয়। তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা বড় কুলীন ছিলেন। খুলনার মুলঘরে তাঁদের আদিবাস ছিল। মূলঘর বৈদ্যপ্রধান স্থান হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। অম্বিকাচরণের বংশ পরিচয় খুব অস্পষ্ট না হলেও তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের বিষয়ে বেশী কিছু জানা যায় না। "মজুমদার" ইহাদের অনেক পরবর্ত্তী কালের উপাধি

---

* অম্বিকাচরণের অনুরোধে তাঁর জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার "মৌদ্গল্য গোত্র—বিষ্ণুবংশ পত্রিকা" শিরোণামায় সংস্কৃতে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি কীটদষ্ট অবস্থায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত আছে। এই বংশ-তালিকায় অম্বিকাচরণের বংশ-পঞ্জী প্রদত্ত হয়েছে। অনুক্রমণিকায় উক্ত হয়েছে, "স্বজননী যতো ধন্যা ধন্যা চ রাষ্ট্রমাতৃকা। বাগ্‌দেবী চ

প্রাপ্তি। বংশ পরিচায়ক হিসাবে "দাশ গুপ্ত" এই স্বল্পায়তন উপাধিটি ইঁহারা পুরুষ-পরম্পরায় বহন করে এসেছেন। এই উচ্চ কুলীন বংশের

যতো ধন্যা ধন্যা চ কুলমাতৃকা॥ বাগ্মিনং জন্মভূ-ভক্তমম্বিকাচরণং ভজে। যস্যোৎসাহ প্রসারেণ মমাল্পজ্ঞস্য যোগ্যতা॥ * * * লালাবংশো মহান্ যো হি বলভদ্রসমুদ্ভবঃ। জপ্সাপুরেশ্বরো বৈদ্যকুলীন কুলপর্ব্বতঃ॥ তদ্বংশপ্রভবো ধীমানানন্দনাথকঃ কৃতী। বেত্তা চ ইতিহাসানাং কুলস্য রাষ্ট্রিয়স্য চ॥ তেন মহাত্মনা চাত্র সাহায্যং সুমহৎ কৃতম্। ততঃ সফলতা জাতা কুলপত্রস্য সংগ্রহে॥" পুস্তিকায় প্রদত্ত বংশ-পঞ্জী এইরূপ,—চায়ু নামক বৈদ্যবংশসম্ভূত ব্যক্তি রাঢ়বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর বংশসম্ভূত প্রজাপতি বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞরূপে পরিচিত হয়েছিলেন, তৎকৃত "পঞ্চস্বর" নামক গ্রন্থ খ্যাতি লাভ করেছিল। তাঁর ঔরসে বিষ্ণুর জন্ম হয়। বিষ্ণুর প্রপৌত্র নিম প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন ("জ্যেষ্ঠো নিমোহি বিখ্যাতঃ")। নিমের ঔরসে ও দেবের দুহিতার গর্ভে শ্রীনায়ক জন্মগ্রহণ করেন। (নিমাৎ শ্রীনায়কঃ পুত্রো দেবজাগর্ভ সম্ভবঃ।) শ্রীনায়কের পুত্র বাণীনাথ; বাণীনাথের পুত্র রত্নেশ্বর; রত্নেশ্বরের পুত্র বিখ্যাত রামচন্দ্র কণ্ঠভূষণ। আনন্দনাথ রায়ের গ্রন্থে "রামচন্দ্র কণ্ঠভূষণের" স্থলে "রামচন্দ্র কর্ণাভরণ" এই নাম উক্ত হয়েছে। রামচন্দ্রের বংশে কীর্ত্তিনারায়ণের জন্ম হয়। কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্র রামকিশোর, তদীয় পুত্র মাধবচন্দ্র (রাধামাধব), রাধামাধবের পুত্র অম্বিকাচরণ। হিঙ্গুবংশ সমুদ্ভূত নবকিশোরের কন্যা মাধবচন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন।

আলোচনায় আমাদের এইরূপ একটা ধারণা পুষ্টিলাভ করে যে, মানুষের অন্তঃস্থ প্রকৃতি সম্পত্তিবোধের অতিরিক্ত মার্গচারী হয়ে চলতে প্রায় চায় না। কিন্তু সম্পত্তিবোধজাত দ্বন্দ্বকলহ এই বংশের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে, একথা বলাই এস্থলে অভিপ্রেত না। সামন্ততান্ত্রিক যুগ সে সময়ে অব্যাহত ছিল। সামন্ততন্ত্রের আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট সেকালের এই কুলীন পরিবারের চিত্রটী মানসপটে বেশ অঙ্কিত করতে পারি। ইউরোপের অ্যারিষ্টক্র্যাসির মতই একটা অহেতুক আত্মকর্তৃত্ব ও সামাজিক পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে চেতনা এই পরিবারটীকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। মাঝে মাঝে দু'একটী ধর্ম্মানুপ্রাণিত নিষ্ঠাবান সাধক এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ইহাকে অলঙ্কৃত করে গিয়েছেন। ইঁহারাও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার গর্ভজাত সন্তানমাত্র ছিলেন। অম্বিকাচরণের পিতা ও প্রপিতামহ উভয়েই শক্তিসাধকরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এই খ্যাতি চতুষ্পার্শ্বের গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছিল। অম্বিকাচরণ ও তদীয় পিতামহ ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিষয়ে কিছুটা উদাসীন ছিলেন। তবে পিতামহের মত তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল না, স্বার্থের চেয়ে পরার্থেই উৎসর্গীকৃত জীবনের উচ্চতর আদর্শ তাঁর মধ্য দিয়ে স্ফুট হয়েছে। অম্বিকাচরণের ভ্রাতুষ্পুত্রগণের অন্যতম শক্তি-

---

[উপক্রমণিকায় গ্রন্থকর্ত্তা স্বকীয়গ্রন্থে রামকান্ত কণ্ঠহার কৃত "সদ্বৈদ্য-কুলপঞ্জী" হতে উপাদান সংগৃহীত হয়েছে এইরূপ স্বীকৃতি করেছেন।

"কবি শ্রীরামকান্তস্য কণ্ঠহারস্য ধীমতাম্।
সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জীং হি সমাশ্রিত্য মমোদ্যমঃ॥"]

সাধনাকে জীবনের ব্রত-স্বরূপে গ্রহণ করে চলেছেন। এর থেকে, অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, একটা ধর্ম্মানুপ্রেরণার প্রবাহ সুষ্ঠু নিয়মানুসারেই এই পরিবারের অন্তঃশীলা গতিটাকে রূপায়িত করে চলেছে। এই বংশধারার অলক্ষ্য প্রভাব হতে অম্বিকাচরণ নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁর মহানুভবতা, ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ ও নিগূঢ় আত্মসচেনতা তাঁর পরিবারের সামন্ততান্ত্রিক পরিবেষ্টনী ও সংস্কারজাত ফলমাত্র।

আনন্দনাথ রায় সাহিত্যশেখর প্রণীত "ফরিদপুরের ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ডের "সেনদিয়া" গ্রামের বিবরণে অম্বিকাচরণের বংশপরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। তার একাংশ নিতান্ত প্রয়োজন বোধে অপরিবর্ত্তিত আকারে এস্থলে উদ্ধৃত করছি। "বৈদ্য বিষ্ণুদাসবংশীয় শ্রীনায়ক দাশ মহাশয়ের, জানকীবল্লভ, বাণীনাথ, গৌরীনাথ, রমানাথ, ও লক্ষ্মীনাথ নামে পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জানকী স্বীয় ক্ষমতায় খুলনার অন্তর্গত খড়রিয়া পরগণায় জমিদারী লাভ করেন, কিন্তু তাঁর আশঙ্কা হয়, পাছে কনিষ্ঠগণ উহার অংশ দাবি করিয়া বসেন। রমা ও লক্ষ্মী ইতিপূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হন; এখন বাণী ও গৌরী এই দুই শিশুভ্রাতা ও যাহাতে সেই পথের বশবর্ত্তী হন জানকীবল্লভ তাহার চেষ্টাতেই ব্রতী হইলেন। জানকীর পত্নী কিন্তু উহা লক্ষ্য করিয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়েন, কারণ পতির এই বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণকে তিনিই মাতৃস্থানীয়া হইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন অনন্যোপায় হইয়া, এক বৃদ্ধ ভৃত্যকে বশ করিয়া, তদ্দ্বারা যাহাতে এই শিশুদ্বয় দূরদেশে প্রস্থান করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কাজে তাহাই হইল; এক তমসাবৃত নিশিতে ভৃত্য এই দুই

শিশুকে লইয়া স্বদেশ হইতে প্রস্থান করিল। প্রবাদ, জানকীবল্লভের স্ত্রী ভৃত্যকে বলিয়া দেন যে, সে যেন উহাদিগকে লইয়া ভূষণার রাজ-মহিষীর করে সমর্পণ করে ; তিনি অবশ্যই তাঁহাদের সম্বন্ধে যে কোন সুবিধা করিয়া দিতে পারিবেন। ভৃত্য আদেশ মত কার্য্য করিল। ভূষণার রাণী ইঁহাদিগকে অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিলেন এবং তাঁহারা যাহাতে উত্তরকালে ক্ষমতার্জ্জন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তদুপযোগী বিদ্যার্জ্জনের উপায়ও নির্দেশ করিয়া দিলেন।

দিন কাহারও সমভাবে বিগত হয় না। বয়োবৃদ্ধির সহিত বাণী ও গৌরী কৃতবিদ্য হইয়া, বিষয়কর্ম্মানুসন্ধানের জন্য রাণীর নিকট বিদায় গ্রহণানন্তর তৎকালীন রাজধানী ঢাকাতে উপনীত হন। এই সময় গোবিন্দপুর গ্রামে একজন ফৌজদার অবস্থান করিতেন, বাণী তদধীনে এক কার্য্য গ্রহণ করিয়া, গোবিন্দপুরে আগমন করেন। তদীয় কার্য্যকুশলতায় পরিতুষ্ট হইয়া ফৌজদার তৎপ্রতি যারপরনাই অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ফৌজদারের সহায়তাতেই তিনি ফতে-জঙ্গপুর পরগণার তিন আনা পাঁচ গণ্ডা জমিদারী লাভ করিতে সমর্থ হন এবং গোবিন্দপুরেই প্রথম বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তারাদেবীর মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। এই সময় বাণীনাথের "মজুমদার" উপাধি লাভ হইয়াছিল। বাণীনাথের এই জমিদারী, কবিশেখর নামের সহিত জড়িত দেখিয়া, বোধ হয় যে উহা তদীয় পৌত্র কৃষ্ণদেব কবি-শেখরের নামে গৃহীত হইয়াছিল। এই কবিশেখর গোবিন্দপুর পরিত্যাগ করিয়া কান্দুড়িয়াতে বাস স্থাপন করেন। পরে বাণীর দ্বিতীয় পুত্র

রত্নেশ্বর গোবিন্দপুর পরিত্যাগ করিয়া সেনদিয়া আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

সেনদিয়া অতি ক্ষুদ্র স্থান, ইহার চতুর্দ্দিক গড়ে পরিবেষ্টিত। তন্মধ্যে একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা বিদ্যমান দেখা যায়। কিংবদন্তী, উহা মুকুটরায় নামক জনৈক সমৃদ্ধি সম্পন্ন লোক কর্ত্তৃক নিখাত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের নানাস্থানে মুকুটরায় নামধারী বহুলোকের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে কে এই মুকুট রায় ছিলেন উহা নির্দ্দেশ করা সহজ সাধ্য নয়। কেহ কেহ এই দীঘি মজুমদারগণের খনিত বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এক সময়ে এই সরোবরে যে ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট ছিল তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মজুমদার বংশে রামচন্দ্র কর্ণাভরণ ও বিষ্ণুরাম কবিরাজ চন্দ্র মজুমদারের নামই উল্লেখ যোগ্য। এতদ্ভিন্ন আরও পণ্ডিত এই বংশে ছিলেন বলিয়া তাঁহারা গৌরব করিয়া এই স্থানকে, সেনদিয়া বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিতেন। কবিরাজ চন্দ্র মজুমদার সেনদিয়া জন্মগ্রহণ করিলেও পশ্চাৎ খান্দারপাড় গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এতন্নিবন্ধন তাঁহার ও তদ্বংশধরগণের বিবরণ খান্দারপাড়ের বিবরণে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকিবে।

রামচন্দ্রের পুত্র রঘুরাম ও মধুসূদন। কিন্তু মধু জমিদারীর অংশ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার অংশে একখানা তালুক মাত্র ছিল। মধু মজুমদার সম্বন্ধে এই কিংবদন্তী শ্রুত হওয়া যায় যে, তিনি অপরিমিত ভোজন করিতে পারিতেন। বিবাহ রাত্রিতে বাসর ঘরে নব পরিণীতা অকস্মাৎ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভয়ে চীৎকার করায় বাটীস্থ জনগণ তথায় সমবেত হইয়া

চীৎকারের কারণ অবগত হন। অনেকেই মধুর পরিচয় অবগত ছিলেন; একডোল খৈ ও তিন চার কাঁদি কলা দ্বারা ফলাহার করা যে মধুর পক্ষে কোনরূপ আশ্চর্য্যের কথা নয়, এই কথা তাঁহারা বধূকে বিশেষভাবে বুঝাইযা বলায়, মধুর স্ত্রী আশ্বস্তা হন।

শ্রুত হওয়া যায়, যে বাণীনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামনারায়ণ কণ্ঠাভরণ ভ্রাতাদিগকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া সমুদয় সম্পত্তি হস্তগত করেন। পরে কণ্ঠাভরণের সর্ব্বকনিষ্ঠ রত্নেশ্বরের পৌত্র রঘুনাথ মজুমদার উহার উদ্ধার সাধন করিয়া কতক অংশ বাহির করিয়া লন। তদবধি তদীয় সন্তানগণ এই জমিদারী ভোগ করিয়া আসিতেছেন। রামচন্দ্র কণ্ঠাভরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুরামের চারি পুত্র উহা সমানভাবে প্রাপ্ত হইলেও তদীয় তৃতীয় পুত্র রামশঙ্কর এই জমিদারীর অন্তর্গত এক বিস্তৃত তালুক করিয়া অন্যান্য অংশীদারগণের অপেক্ষায় বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হন।

জপ্‌সাবাসী লালা রামপ্রসাদের চতুর্থ পুত্র লালা রাজনারায়ণের সহিত রামশঙ্কর মজুমদারের কন্যার এবং রামশঙ্করের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ মজুমদারের কন্যার সহিত রাজনারায়ণের ভ্রাতুস্পুত্র কবিবর লালা জয়-নারাযণের পুত্র জগচ্চন্দ্রবাবুর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। কীর্ত্তিনারায়ণ অতি তাপস লোক ছিলেন, অধিক বয়সে জপ্‌সা গ্রামে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়। তৎসম্বন্ধে যে সকল বিবরণ মদীয় পিতা ও পিতৃব্যগণ এবং অন্যান্য প্রাচীন লোক নিকট অবগত হইতে পারিয়াছি উহা নিম্নে বিবৃত করা হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কীর্ত্তিনারায়ণ সর্ব্বদাই তপস্যায় নিযুক্ত

তোমাদের কার্য্য সম্পাদন কর। ইতিপূর্ব্বেই তথায় জনতা হইয়া হরি-সংকীর্ত্তন, কালীকীর্ত্তন চলিতেছিল, কীর্ত্তিনারাযণেব দেহাবসানের সহিত উহা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া, দূরদূরান্তরে তাঁহার স্বর্গগমন বিঘোষিত করিয়া দিল। কীর্ত্তিনারারণের পুত্র তথায় উপস্থিত না থাকিলেও তদীয় ভ্রাতুস্পুত্র তারিণীপ্রসাদ স্বীয় মাতামহ ভবন এই লালাবাবুর বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিই তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য স্বজাতির সহাযতায় তাঁহার শেষকার্য্য সম্পাদন করেন।

কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্র রামকিশোর মজুমদার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন ঘোর বিষয়ী লোক ছিলেন। তৎপুত্র রাধামাধব কিন্তু পিতামহের ন্যায়ই জপ ও তপেই নিযুক্ত থাকিতেন। এই রাধামাধব মজুমদার মহাশয়ের যথাক্রমে পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে স্বদেশহিতৈষী বাগ্মীপ্রবর অনারেবল্ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চতুর্থ।" (১২৩-১২৮ পৃষ্ঠা)

'পারিবারিক দ্বন্দ্ব"

অম্বিকাচরণের খুল্লপিতামহীর সতীগমন উপলক্ষ্যে পিতা ও পিতা-মহের মধ্যে মতদ্বৈধ হয়েছিল। এই মতভেদের পরিসমাপ্তি অম্বিকা-চরণের পিতা রাধামাধবের পক্ষে মঙ্গলকর হয়নি। * পিতামহ রাম-

* ৺হেমচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় লিখিত অম্বিকাচরণের সংক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ জীবনী অমুদ্রিত অবস্থায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আলয়ে রক্ষিত আছে। এই সংক্ষিপ্ত জীবনীর প্রথম পৃষ্ঠায়

কিশোর ছিলেন অতি বৈষয়িক লোক, সংসারের উপযোগী কূটবুদ্ধি তাঁর এত অধিক পরিমাণে ছিল যে আশেপাশের ক্ষমতাশালী জমীদারগণ তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতেন না। অথচ তাঁর ঐশ্বর্য্য ও বিত্ত সম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে থাকলেও তিনি প্রতিবেশী জমীদারগণের সমকক্ষ ছিলেন না। তদীয় পুত্র রাধামাধব রীতিমত সংস্কৃত ও পার্শী ভাষায় জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তিনি সরলবিশ্বাসী সাদাসিধে মানুষ ছিলেন, সংসারের কপটতা ও আবিলতা তাঁর হৃদয়কে কোনদিন স্পর্শ করতে পারেনি। স্বীয় সততার শাস্তিস্বরূপ পিতার দুর্জ্জয় ক্রোধ বরণ করে সারাজীবন নিঃস্বতার মধ্য দিয়ে তাঁকে চলতে হয়েছিল। যে করুণ ঘটনা সুখী পরিবারের মধ্যে অশান্তির কালীমা সঙ্গে করে নিয়ে এল তার মর্ম্মার্থ খুব একটা সাধারণ ব্যাপার। রাধামাধবের খুল্লতাত যশোহরে কার্য্যোপলক্ষে থাকাকালীন মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর প্রিয়তমা পত্নী পতিবিরহে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন এবং রাজপুত রমণীর মতই তাঁর সতী-গমনে অটল সঙ্কল্প হল। সে সঙ্কল্পচ্যুত কেউ তাঁকে করতে পারলে না। নানা রকমের প্রবোধ বাক্য এবং বহুবিধ ধর্ম্মোপদেশ বর্ষিত হল। কিছুতেই তাঁর মনোবাসনা পরিবর্ত্তিত করতে

রামকিশোরের পরিচয় বর্ণিত হয়েছে, "His grand father Babu Ramkishore Mazumder was a man of great power and influence though he was never so rich as some of the neighbouring Zaminders against whom he had to contend throughout his life." (Life of Late Babu Ambikacharan, Page 1).

কারু সাধ্য হলো না। এসময়ে সতী প্রথা একেবারে অপ্রচলিত হয়ে যায়নি। কোম্পানীর আমলে যে নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়েছিল তার সর্ত্ত অনুসারে জেলাহাকিমের নিকটে স্বীয় অনমনীয় সংকল্প প্রমাণিত হলেই কোন রমণী সতী গমনে অনুমতি লাভ কোরত। এরূপ নিয়ম সত্ত্বেও গোপনে গোপনে অনুষ্ঠিত "সতীর" কাহিনী না শুনা যেত এমন নয়। রামকিশোর ভ্রাতৃজায়ার মনের বাসনা অবগত হয়ে তদনুযায়ী আয়োজন সুরু করেন। তাঁর অনুগৃহীতেরা তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হোল। কিন্তু রাধামাধব বেঁকে বসলেন। তাঁর মতে জেলার হাকিমের দৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনাটি পড়ুক, যাতে সকলেই প্রকৃত বিষয় জানতে পারে, বংশের প্রতি কলঙ্কারোপের কারু কোন সুযোগ বা অবসর থাকে না, তিনি বললেন। রামকিশোরকে টলানো সম্ভব না হওয়ায় নিরুপায় হয়ে তিনি যশোহরে গমন করেন এবং তৎপরবর্ত্তী ঘটনার সারাংশ এই—তাঁর প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে অনতিবিলম্বেই ইউরোপীয়ান খাঁটী সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের এক বৃহৎ বাহিনী ও স্বীয় দল বল নিয়ে সেনদিয়াতে এসে হাজির হলেন। তিন দিন যাবৎ তিনি রাধামাধবের খুড়ীমাকে প্রশ্নবানে জর্জ্জরিত করেও নিরস্ত করতে অসমর্থ হলেন। তাঁর উপস্থিতিতেই পতিগত প্রাণা রমণী জলন্ত চিতায় আরোহণ করে নশ্বর দেহ বিসর্জ্জন দিলেন। এতেই কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটীর সমাপ্তি হোল না—রামকিশোরের ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাপিত হয়নি—পুত্রের কৃত-কর্ম্মের শাস্তিবিধানের জন্য স্বীয় ভাগিনেয়ের নামে সমস্ত বিত্তসম্পত্তি বেনামী করে তার উপরেই রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করলেন। বিশ বৎসর পরে পিতার মৃত্যু

হোলে রাধামাধব বিচারালয়ের আশ্রয় নিয়েও স্বকীয় ন্যায্য সম্পত্তি-লাভে অধিকার পেলেন না। সংসারের প্রতি তাঁর বীতশ্রদ্ধা ও ধর্ম্মানুরাগ কতকটা এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপেই হয়েছিল।

"রাধামাধবের প্রকৃতি"

সমস্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়ে রাধামাধব নিজ গৃহেই দরিদ্রের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। সংসারের প্রতি ক্ষীণতম অনুরাগ তাঁর মানসে স্থান পায়নি। কঠোর নিয়মের অধীনে সাত্ত্বিক-মার্গী হয়ে আজীবন ছিলেন। আহার বিহার ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে সংযম, এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহে তাঁর সাধনা বলবৎ ছিল। শুনা যায় তিনি নাকি স্বপাক আহার করতেন, দিবারাত্রির একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে আতপ-তণ্ডুলের অন্ন তাঁর পথ্য ছিল। কোন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনেও এরূপ মিতাচারিতা ও শুদ্ধাচার কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি সর্ব্বদা নির্জ্জনে একাকী অবস্থান করতেন। বিশেষ কার্য্যব্যপদেশ ছাড়া কেউ তাঁর সাক্ষাৎ পেত না। জপ তপ ধ্যান ও যোগাভ্যাসেই রত থাকতেন। গৃহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিলনা বললেই হয়। এমন কি পুত্রকন্যাগণের প্রতি স্নেহ তাঁর সাধনপথের বিঘ্ন জন্মায়নি। মৃত্যুর পূর্ব্বে এক দিবস অম্বিকাচরণকে গোপনস্থানে ডেকে নিয়ে গিয়ে স্বকীয় আধ্যাত্মিক জীবনের রহস্য কিঞ্চিৎ উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। তিনি নিজেকে ব্রাহ্ম বলতেন, অবশ্য প্রচলিত অর্থে নয়, ব্রহ্ম-সংবিৎ তাঁর লাভ হয়েছিল, এরূপ বিশ্বাস তাঁর ছিল। "জ্ঞানেই কর্ম্মের বসতি" এই উপদেশটীর

অনুসরণ করতে তিনি ভাল বাসতেন। অপরকেও অনুসরণ করতে বলতেন। এই উপদেশটী তাঁর দেশবরেণ্য পুত্রের স্মৃতিপটে অমূল্য-রত্নের মত বিরাজমান ছিল। তিনি শক্তি সাধক ছিলেন। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক সর্ব্বানন্দের বংশধরগণ তাঁর কুলগুরু ছিলেন। অনেক-প্রকারের কল্পিত অলৌকিক ঘটনাবলী তাঁর পিতামহের মতই তাঁর নামের সঙ্গেও জড়িত হয়ে এসেছে। সরল জীবনযাত্রা তাঁর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল। তাঁর নিঃসঙ্গতাপ্রীতি ও সাধুজীবন অম্বিকাচরণকে খুব বেশী প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয় না, বরঞ্চ তাঁর প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত "সামাজিক প্রকৃতি" অম্বিকাচরণ লাভ করেছিলেন। (—অম্বিকাচরণ মজুমদারের ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দমোহন মজুমদারের স্ত্রীর নিকটে শ্রুত বিবরণ)।

রাধামাধবের সংসার বিরক্তির পিছনে একটী ঘটনার বিবরণ এইরূপ শুনা যায়। একদিবস রাত্রিকালে বাটীর বাহির হয়ে তান্ত্রিক উপাসনার নিমিত্ত শ্মশান অভিমুখে চলেছেন, এমন সময়ে স্বীয় পশ্চাদ্গামী স্ত্রীর আহ্বান শুনতে পেলেন, কুপিত হয়ে আলয়ে প্রত্যাগমন করলেন। পত্নীকে উদ্দেশ করে ক্রোধ প্রকাশ করতে তিনি নিদ্রাত্যাগ করে এসে স্বামীকে ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর সমস্ত ব্যাপারটী নিখুঁতরূপে পর্য্যবেক্ষণ করে তাঁর স্বামীর মনে দৃঢ় প্রত্যয় হল যে, তাঁর উপাস্য দেবী মা ভবানী তাঁকে দর্শন দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছেন। সেই অবধি বিকৃতপ্রায় মস্তিষ্ক হয়ে তিনি বেঁচে রইলেন। আধ্যাত্মিক মানস পরিণতি সাধারণতঃ সংসারের আঘাত পেয়ে অথবা অস্বাভাবিক আত্ম-চেতনা হতে উদ্ভূত হয়ে থাকে, রাধামাধবের জীবনেও নিজের

অপ্রকৃতিস্থ কল্পনাশক্তির ফল প্রসূত হল। অনেক সময়ে তিনি পাগলের মত আচরণ করতেন। এ কারণে আত্মীয়-স্বজনের হস্তে নির্য্যাতন পর্য্যন্ত তাঁর ললাটলিপি হয়েছিল।

"অম্বিকাচরণের জননী"

১৮৫১ খৃঃ, ৬ই জানুয়ারী (১২৫৭ বঙ্গাব্দের ২৩শে পৌষ) অম্বিকাচরণের জন্ম তারিখ। তিনি পিতামাতার সপ্তম সন্তান ছিলেন, এবং ভ্রাতৃগণের মধ্যে ষষ্ঠ ছিলেন। রাধামাধবের ঔরসে এবং সুভদ্রা-দেবীর গর্ভে ক্রমান্বয়ে গুরুচরণ, দুর্গাচরণ, পার্ব্বতীচরণ, উমাচরণ, পদ্ম-কুমারী, কৃষ্ণচরণ, অম্বিকাচরণ, ও রাসবিহারী জন্ম গ্রহণ করেন। উমাচরণ বার বৎসর বয়সে এবং দুর্গাচরণ চৌদ্দ বৎসর বয়সে অকাল মৃত্যুর কবলে পতিত হন। সুভদ্রাদেবী মহীয়সী মহিলা ছিলেন, অসাধারণ বুদ্ধির দীপ্তি ছিল তাঁর, যা সচরাচর দেখা যায় না। বাঙ্গালী পরিবারে সাধারণতঃ যে অশান্তিময় আবহাওয়া দৃষ্টিগোচর হয়,—অনেক সময় রমণীকুল এর ইন্ধন যুগিয়ে থাকে, আবার পারিবারিক পুরুষসিংহদিগের দ্বন্দ্বকলহে এঁরাই শান্তিদেবতার দূতের কার্য্য করে থাকেন। যৌথপরিবারে ঝগড়া কলহ অপরিহার্য্য। তাই সুভদ্রা দেবীর জীবন সুখাবহ ছিল না। বৈরাগ্য-ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর কারণে এবং স্বীয় পুত্রদিগের মধ্যে কলহের দরুণ তাঁর অন্তরে সুখের অবকাশ-মাত্র ছিল না। তিনি অত্যন্ত ধীর স্বভাবা ছিলেন, অপরিসীম সহন-শক্তির বলে বিপর্য্যস্ত সংসারে পুত্রগণের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করতে যত্নপর

ছিলেন। পুত্রদিগের মধ্যে পার্ব্বতীচরণ স্বার্থপর ছিলেন। সম্পত্তি-বোধ মানুষের মজ্জাগত হলেও পার্ব্বতীচরণের কিছু অধিকমাত্রায় ছিল। ভ্রাতাভগ্নীগণের প্রতি তাঁর কোনরূপ মমতা ছিল না। দেবীতুল্য জননীর শত চেষ্টাতেও একক সংসারে তাঁকে বেঁধে রাখা গেল না। তিনি পৃথক হয়ে গিয়ে ভিন্ন সংসার স্থাপন করলেন।

পার্ব্বতীচরণ যখন ভিন্ন বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন, তখন অম্বিকাচরণ বালকমাত্র। সেজদাদার আচরণে ব্যথিত বালক ম্রিয়মান হয়ে ভ্রাতাগণের মধ্যে মিলনের উপায় অন্বেষণ করতে লাগল। সংসারের মলিনতামুক্ত বালকের মনে নানা কল্পনার উদয় হল। অবশেষে স্বীয় সারল্যপ্রযুক্ত এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করল। অপর ভ্রাতাদিগের অজ্ঞাতে কয়েকশত টাকা সংগ্রহ করে সেজদাদাকে দান করে তাঁর সঙ্কীর্ণ চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করল। পার্ব্বতীচরণ ধূর্ত্ত ছিলেন, অযাচিত প্রাপ্তিকে স্বীকার করে নিলেন, কিন্তু বালকের মিলনের স্বপ্নকে কপটবাক্যে ধূলিসাৎ করে দিলেন। বালক তখন অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে নিদারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে অপর দাদাদের শরণাপন্ন হল। অতঃপর অবিমৃষ্যকারিতার জন্য মৃদু ভর্ৎসনামাত্র তার লাভ হল। এই সকরুণ অভিজ্ঞতা অম্বিকাচরণ কোনকালে ভুলতে পারেন নি। (—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকটে প্রাপ্ত বিবরণ)।

অম্বিকাচরণের জননী এক দিক দিয়ে ভাগ্যবতী ছিলেন। তাঁর পুত্রগণ কখনও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। জ্যেষ্ঠপুত্র গুরুচরণ পিতার ধর্ম্মজীবন দ্বারা অণুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই বংশের অপর সকলের মতই শাক্ত সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক সাধনাকে তিনি আধ্যাত্মিক শ্রেয়ো-

লাভের উপায় বলে বিবেচনা করতেন। ষট্‌চক্রসাধনা সম্বন্ধে তিনি বঙ্গভাষায় * মুক্তিমিমাংসাতত্ত্ব নামে একখানি গ্রন্থপ্রণয়ন করেছিলেন। গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। পুত্রগণের মধ্যে অম্বিকাচরণ পরবর্ত্তী জীবনে বংশগৌরব বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন; কনিষ্ঠ পুত্র রাসবিহারী চিরকাল অম্বিকাচরণের একান্ত অনুগত হয়েছিলেন। পার্ব্বতীচরণ ব্যতীত সকল পুত্রকন্যাগণেরই মাতৃভক্তি অবিচল ছিল।

বাল্যকালে অম্বিকাচরণ অত্যন্ত চঞ্চল-প্রকৃতি ছিলেন এবং একগুঁয়ে ছিলেন। কারু কথা শুনে চলা অথবা বশ্যতাস্বীকার করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। বালক অম্বিকাচরণ বালক ঈশ্বর বিদ্যা-

---

* এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের একখানি মাত্র ছিন্নাবস্থায় আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এলোমেলো ভাবে ভারতীয় দর্শনের তত্ত্বালোচনায় গ্রন্থের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। জটিল তত্ত্বগুলি পদ্যের আশ্রয়ে বর্ণনা করে গ্রন্থকার প্রাচীন রীতির অনুসরণ করেছেন। স্থানে স্থানে সংস্কৃত রূপক-নাট্য প্রবোধচন্দ্রোদয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একস্থলে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে পরিকল্পিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিবাদ এইরূপে সূচিত হয়েছে:—

"শুনিয়া নিবৃত্তি বাক্য প্রবৃত্তি মোহিণী,
ধরিয়া জ্ঞানের করে, বলিছে অমনি।
নিবৃত্তির প্রলাপেতে হইয়াছ ভ্রান্ত,
আমার শুনিয়া বাক্য হও তুমি শান্ত।"

(২২ পৃষ্ঠা)

সাগরের ন্যায় একরোখা ন্যায়নিষ্ঠ এবং আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ক্রোধ কাউকে মেনে চলত না। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে যেতেন এবং শুভাশুভ বিস্মৃত হয়ে অন্ধবৎ আচরণ করতেন। তাঁর একগুঁয়েমী এবং ক্রোধ সহ্য করার মত শক্তি একমাত্র তাঁর জননীর ছিল। সুভদ্রাদেবী এই অবোধ শিশুর আব্‌দার যথাসাধ্য রক্ষা করে চলতেন। অপর সকলে এই শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হলেও তিনি আশা পোষণ করতেন। অবাধ্য শিশুকে বশে আনতে সর্ব্বদা তিনি শান্তচিত্তে উপায় উদ্ভাবন করতেন, কখনও বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিতেন না। সেকালের গ্রাম্যরমণীর পক্ষে এ বড় কম কথা নয়। এরূপ সহনশীলতা না দেখাতে পারলে তাঁর এই শিশুপুত্রটীর নৈতিক বিকাশ কখনই আশানুরূপ হোত না। এই শিশুটীর জন্য তাঁর চিন্তার অবধি ছিল না। বোধ হয় এই কারণেই অন্যান্য পুত্রগণ অপেক্ষা এই ছেলেটিকেই তাঁর মাতৃ-অন্তর কিঞ্চিৎ পক্ষপাত করে অধিক ভালবেসে ফেলেছিল।

অম্বিকাচরণের চরিত্রে যদি কারু প্রভাব স্বীকার করতে হয়, তবে তাঁর জননীর নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করা উচিৎ। মায়ের কাছে তিনি চির-ঋণী ছিলেন। মায়ের প্রতি ভক্তিও একনিষ্ঠ সেবকের মতই তিনি পোষণ করতেন। কর্ম্মজীবনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্পর্শে এসে তিনি নূতনতর দৃষ্টি দিয়ে মাকে চিনতে পেরেছিলেন। জননীর শেষ বয়সে তাঁকে স্বীয় ফরিদপুর সহরে স্থিত বসতবাটীতে নিয়ে এসেছিলেন এবং নিজের মনোমত তাঁর শুশ্রূষা ও সেবাবিধানে তৎপর হয়ে তাঁর আনন্দের হেতু হয়েছিলেন। তাঁর নিমিত্তেই বৃদ্ধ মাতা

শেষের দিনগুলি অপেক্ষাকৃত শান্তিতে কাটিয়েছিলেন। জননীর জীবনলীলা অবসান হলে অম্বিকাচরণ মাতার নামে একটী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঠের নিভৃত কোণটীকে তিনি বরাবর তীর্থের মত মনে করে এসেছেন।

"অম্বিকাচরণের বাল্যজীবন"

বাল্যকালে অম্বিকাচরণ খুব দুরন্ত ছিলেন না। তবে বড় রাগী ছিলেন। কেউ তাঁকে অন্যায় শাসন করলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। যেস্থলে সত্যকার ত্রুটী বর্ত্তমান থাকত, সেস্থলে তাঁকে কেউ কিছু বললে নীরবে সহ্য করতেন। অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে না পারলে তাঁর মনের অবস্থা শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্যপশুর আকার ধারণ করতো। তেজস্বী প্রকৃতির দরুণ বালককালেই তাঁকে অনেক দুঃখবরণ করতে হয়েছিল।

তাঁর ছেলেবেলাকার একটী স্মরণীয় ঘটনা তিনি বৃদ্ধবয়সে অনেক সময় গল্প করতেন। বালক অবস্থায় তাঁর একটী সখ ছিল, নেউলের অনুগামী হয়ে ছুটে বেড়ানো। একদিন বেশ একটু অনর্থের সূত্রপাত এই কারণেই হয়েছিল। নেউলের পশ্চাতে ছুটছেন, এমন সময় একটী বিষধর সর্প (পূর্ব্ববঙ্গে গোখুরা সাপ বলে পরিচিত) তাঁকে অকস্মাৎ আক্রমণ করল। সন্ত্রস্ত বালক উলঙ্গপ্রায় হয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। আক্রমণকারী সর্প পরিধানের বস্ত্রের অতিরিক্ত কোন শরীরের অঙ্গস্পর্শ না করে চলে গেল। একটী নমঃশূদ্র মেয়ে

ব্যাপার দেখে চীৎকার করতেই বালকের জননী ত্বরিৎপদে ঘটনার স্থলে ছুটে এলেন। * পলায়মান সর্পকে আঘাত করতে তিনি নিষেধ করলেন, মা মনসার শিশুর উপরে কৃপা হয়েছে এইরূপে তিনি ঘটনার এক প্রচলিত সংস্কার মত ব্যাখ্যা দিলেন। যাহোক একটা আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হতে বালক নিস্তারলাভ করল। অতঃপর পাড়াগাঁয়ের প্রথা মত গণক ঠাকুরকে আহ্বান করা হোল। তিনি ঘটনার কলেবর ঘেঁটে বালকের জন্য সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ শুভের সূচনা আবিষ্কার করে ফেললেন। অম্বিকাচরণ বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়ে বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বিশ্লেষণ করে কখনো কখনো নাকি আপশোষ করতেন যে, বাটটা গ্রীষ্ম ঋতু নির্ব্বিবাদে পার করে এসেও তিনি উক্ত শুভসূচনা, অর্থাৎ রাজতক্তে আরোহণ করার কোন লক্ষণ দেখতে পেলেন না। ("Ma Manasa had her presents within a few daysand the astrologer his fees ; the lucky boy has had sixty summers passed over his head, but as yet there has appeared not the faintest sign of the prediction nearing its fulfilment" P.4, 'Life of Late Babu Ambikacharan")

---

* শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ণিত ঘটনা অনুসারে সর্পটা বালকের পরিধানের বস্ত্র অবলম্বন করে মস্তকের উপরে ফণাবিস্তার করেছিল এবং সে অবস্থায় বালকের জননী উপস্থিত বুদ্ধিমত তাকে স্থির হয়ে দণ্ডায়মান থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপর মনুষ্য সমাগম দেখে সর্পটা কোন অনিষ্ট না করে বালকের শরীর স্পর্শ না করে আপন গন্তব্য পথে চলে গিয়েছিল।

"শিক্ষারম্ভ"

সাত বৎসর বয়স কালে অম্বিকাচরণ গ্রামের পাঠশালায় প্রেরিত হন। তখনকার কালের এই পাঠশালা সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে যথার্থ ধারণা করা কঠিন। এই নামে অভিধেয় অপূর্ব্ব বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানটীতে নিয়ম শৃঙ্খলার বড় বেশী কড়াক্কড়ি ছিল এবং শিক্ষক ও পরিচালক এক ব্যক্তিতে সন্নিবিষ্ট হয়ে "গুরু মহাশয়" নামক অদ্ভুত জীবটির জন্ম দিয়েছিল। গুরুমহাশয়ের প্রকৃতি ও তৎপ্রদত্ত বিবিধ শাস্তির বিবরণ অনেক ঐতিহাসিকের মারফত আমরা পেয়ে এসেছি। বালক অম্বিকাচরণের জন্যে উক্ত উপাধিধারী যিনি এসে জুটলেন, তাঁর অধ্যাপনায় অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার সুযোগ তাঁর হয়নি। পাঠশালার ভারপ্রাপ্ত কৃষ্ণচন্দ্র সরকার একপায়ে খঞ্জ ছিলেন। সেজন্যে লোকে তাঁকে "লেংরাকেষ্টো" বলে ডাকত। তবে আর্য্যা ও শুভঙ্করীতে তাঁর রীতিমত অধিকার ছিল। পাণ্ডিত্যের বড়াই তাঁর বেশ ছিল। বেত্রহস্তে নগ্নগাত্রে উপবিষ্ট ক্ষণে ক্ষণে বদন ও নাসিকার বিবিধ ভঙ্গিমা প্রদর্শনে পটু একটী মানসচিত্র মনে মনে কল্পনা করুন; এহেন গুরু-মহাশয়ের শিক্ষায়তনে অম্বিকাচরণকে নিয়ে যাওয়া হল। উক্ত পাঠশালায় ছাত্রদের দুটী শ্রেণী ছিল—অগ্রগামী ছেলেরা তক্তপোষের উপরে উপবেশন করতে পারত, যে সকল ছেলেরা অতদূর অগ্রসর হয়নি তারা নীচে মেজেতে মাদুরের উপর বোসত। তারাই 'কলা পেতে পোড়ো বা তাল পাতায় পোড়ো' নামে অভিহিত হোত। একগুঁয়ের চূড়ামণি অম্বিকাচরণ নীচে বসতে রাজী হলেন না, যদিও

তিনি কলাপাতা ও তালপাতার তলোয়ার হস্তে বালকসৈনিকের বেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর জন্যে এই নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র অধ্যয়নাগাররূপ সমরক্ষেত্রের সারথি কৃষ্ণচন্দ্র সহজ পাত্র ছিলেন না, তিনি একটী কড়ারে বালককে তক্তপোষে উপবেশন করার অধিকার প্রদান করলেন। বালক যদি সাতদিনের ভিতরে কলাপাতার নির্দ্ধারিত পাঠ শেষ করতে সক্ষম না হন, তাহলে তাঁকে মাদুরে উপবিষ্ট ছেলেদের দলভুক্ত হতে হবে। বালক উৎসাহিত হয়ে ঐ অবধারিত সময়ের মধ্যেই একাক্ষর ও যুক্তাক্ষর বর্ণমালা পাঠ সাঙ্গ করলেন; এবং কলাপাতায় স্বরবর্ণ হতে সুরু করে নামলিখনে পটুতা অর্জ্জন করে গুরুমহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। এতে নিয়ে মাদুরে উপবিষ্ট ছেলেগুলির ঈর্ষা উদ্দীপ্ত হওয়ায় তারা তাঁকে গুরুমহাশয়ের ক্রোধের সম্মুখে নিক্ষেপ করার উপায় অনুসন্ধান করতে লাগল। একদিন নির্দ্দিষ্ট কলাপাতার লেখা সমাপ্ত করে পাঠ করছেন, এমন সময় তাঁর হস্তলিপিচিহ্নিত একটী কলাপাতার অভাব অনুভব করলেন। দুষ্টছেলেদের এই কীর্ত্তি গুরুমহাশয়ের অজ্ঞাতে সাধিত হয়েছিল। তারা অবসর মত উক্ত অপহরণের বিষয়ে অজ্ঞতার মনোভাব প্রকট করে বালকের শাস্তি বিধানের নিমিত্ত জিদ ধরল। বালক অসহায়ের মত প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ লেখাটী প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর আত্মবিশ্লেষণ উপেক্ষা করে গুরুমহাশয়ের যমদণ্ডতুল্য বেত্রখণ্ড তাঁর কোমল করপল্লবে কয়েকবার পতিত হোল; তাঁর মুখ হতে কোন ক্রন্দনধ্বনি নির্গত হোল না, আহত সিংহ শাবকের মত নিষ্ফল ক্রোধের আচরণ করে পাঠশালা হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। এই

খানেই পাঠশালার সহিত তাঁর সম্পর্কের অবসান হোল। পরদিবস যথাসময়ে পাঠ আরম্ভ হলে অপহৃত কলাপাতার অংশ একটি পড়ুয়ার আসনের নিম্নে আবিষ্কৃত হোল; কিন্তু গুরুমহাশয়ের শত কাকুতিমিনতি এবং অপরাধী বালক কর্ত্তৃক অপরাধ স্বীকার সত্ত্বেও বালকের ক্রোধোপশম হোল না।

অম্বিকাচরণের জননী প্রতিপাদন করলেন যে, কপিজাতীয় পশু-শ্রেণীর সহিত তুলনীয় একটী উন্মার্গগামী ছেলেকে তার স্বনির্দ্দিষ্ট পন্থা হতে প্রত্যানিবৃত্ত করা যায় না। বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের উপরে তাঁর শিক্ষার ভার অর্পিত হোল। দাদাদের নিকটে তিনি সামান্য লিখন ও পঠন প্রণালী আয়ত্ত করলেন।

"বিদ্যালয়ে অম্বিকাচরণ"

গ্রাম্য পাঠশালাটীর আয়ু ফুরিয়ে এল। সেনদিয়ার নিকটবর্ত্তী খালিয়া গ্রামে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী ও দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হোত। চারিপার্শ্বের গ্রাম হতে বহু সংখ্যক বালক এই নূতন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হোল, অম্বিকাচরণও তাদের দলে এসে জুটলেন। অম্বিকাচরণ অতিশীঘ্রই স্বশ্রেণীতে শ্রেষ্ঠ স্থানটী অধিকার করলেন, গোবিন্দ চন্দ্র দাস ও রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে দুইজন শিক্ষক তাঁকে প্রীতির চক্ষে দেখতে লাগলেন। এই শ্রদ্ধা-ভাজন শিক্ষকদ্বয়ের পুণ্যস্মৃতি অম্বিকাচরণ মর্ম্মান্তরালে গোপন করে রেখেছিলেন। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের মোহপাশে অধিকদিন আবদ্ধ

হয়ে তিনি থাকতে পারেন নি। এক দিবসের সামান্য ঘটনায় এই শিক্ষায়তনের প্রতি তাঁর বীতরাগ হোল। বর্ষাকালে নৌকায় করে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে যেতে হোত। একটী বৃষ্টির দিনে অম্বিকাচরণ প্রভৃতি কয়েকজন ছাত্র বিদ্যালয়ে পৌছুতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করে ফেলেছেন—অম্বিকাচরণের কোন ত্রুটীর জন্যে এই বিলম্ব হয় নি – তাঁর সঙ্গীরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যথার্থ সময়ে এসে নৌকারোহণ করতে পারে নি। কিন্তু বিলম্বের প্রকৃত কারণ প্রদর্শিত হলেও প্রধান শিক্ষক মহাশয় কারু কথা কর্ণপাত না করে সবাইকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করতে চেয়ে এক শাস্তি বিধান করলেন; সকলকে সারাদিন ঠায় দণ্ডায়মান থাকতে হোল। অম্বিকাচরণ উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেও হেডমাষ্টার মহাশয়ের মত পরিবর্ত্তনে অক্ষম হয়ে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন আর কখনো এই বিদ্যালয়ের প্রবেশপথ অতিক্রম করবেন না। এইরূপে খালিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হোল।

"অধ্যয়নার্থে বরিশালে গমন"

ভাইয়েরা তাঁর আশা একেবারে ছেড়ে দিলেন। তাঁর মাতৃদেবী শুধু তাঁর সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করতে লাগলেন। তিনি পুত্রদিগকে অনুরোধ করে অম্বিকাচরণকে অধ্যয়নার্থ অন্যত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন। ১২৬৬ বঙ্গাব্দের পূজার অব্যবহিত পরেই অম্বিকাচরণ বরিশালে প্রেরিত হন এবং সেখানকার বরিশাল স্কুলে প্রবেশ লাভ করেন। সেখানেই সুপ্রসারিত ক্ষেত্রের মধ্যে তিনি নিজেকে অনুভব

করতে সুযোগ পেলেন। নূতন আবহাওয়া এবং মনোমত সঙ্গীলাভে তাঁর চিত্তবিকাশের পথ প্রশস্ত হ'ল। তিনি নির্ব্বিরোধী হলেও একেবারে শান্তশিষ্ট গোবেচারাগোছের ছিলেন না। সুন্দর স্মৃতিশক্তি ও প্রদীপ্ত বুদ্ধির মালিক ছিলেন তিনি, তাই যথাসম্ভব অল্পসময়ে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে নানা প্রকারের ক্রীড়ামোদে সঙ্গীদের আকর্ষণ করতেন। ছাত্রসঙ্গীরাও তাঁর প্রতি নানাকারণে আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে শিক্ষকেরাও তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

এই বিদ্যালয়ে পাঠকালীন বালক অম্বিকাচরণ বেশ চতুর ছেলেটীর মত একজন শিক্ষককে কেমন সুন্দর ছলনা করেছিলেন, একটি ঘটনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিত জগদীশ তর্কালঙ্কার একখানি পুস্তক প্রণয়ণ করেন। বিদ্যালয়ে স্বকৃত পুস্তকখানি পাঠ্য হিসাবে গৃহীত হয় এইজন্য তিনি চেষ্টা করছিলেন। প্রায় সকল ছেলেরাই পণ্ডিত মহাশয়ের "বাণিজ্যদর্পণ" ক্রয় করতে বাধ্য হোল। অম্বিকা-চরণ পুস্তক বিক্রয় করে পণ্ডিত মহাশয়ের অর্থপ্রাপ্তি হবে এই ব্যবসায় বুদ্ধির বিরোধী ছিলেন। অভিভাবকদের নিকট হতে উক্ত পুস্তকখানি ক্রয় করার জন্য একটাকা অধিক প্রাপ্ত হলেন, কিন্তু ময়রার দোকানের প্রতি তাঁর অধিকতর আসক্তি থাকায় "বাণিজ্যদর্পণ" ক্রয় করা সম্ভব হোল না। পণ্ডিতের ঘণ্টায় তিনি সম্মুখের বেঞ্চি বর্জ্জন করে:অন্যত্র আসন গ্রহণ করে অপরের পুস্তক দেখেই পড়া চালিয়ে দিতেন, কিন্তু কয়েকদিন মাত্র পণ্ডিতমহাশয়ের চোখে ধূলি দিতে সক্ষম হলেন। যেদিন ধরা পড়লেন, পণ্ডিত মহাশয় তো রেগে খুন। চতুরাগ্রণী

কিশোর বালক প্রত্যুৎপন্নমতির উৎকর্ষ হেতু পুস্তক ক্রয়ের বিষয়টিকে একেবারে চাপা দিলেন। সরলতার অবতার পণ্ডিত মহাশয় নিজের অজ্ঞাতে কখন গৃহপালিত জীবজন্তুর জগতে উড্ডীন হয়ে পশুপ্রকৃতি সম্বন্ধে অতিবাচাল হয়ে পড়েছেন, এই শুভমুহূর্ত্তের সুযোগ গ্রহণ করে বালক পণ্ডিতমহাশয়ের অতিপ্রিয় বস্তু নেউলের কথা পাড়লেন এবং তাঁর জন্যে এই অপরূপ পশুজাতীয় পদার্থের একটী জীবন্ত বিগ্রহ উপহার দিতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। এই প্রকারে সেই দিবসের সমস্যার সমাধান হোল। বস্তুত পণ্ডিত মহাশয়ের ভাগ্যে এই পশুপ্রাপ্তি ঘটে নাই, কেননা প্রাপ্তির সূচনাতেই তাঁকে অন্যত্র প্রেরণের নিমিত্ত সরকারী তাগিদ এল। অম্বিকাচরণ স্বস্তির নিশ্বাস মোচন করলেন।

অম্বিকাচরণ এই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক গৌরনারায়ণ রায়ের প্রিয়ছাত্র হয়েছিলেন। তদীয় প্রভাবের বশবর্ত্তী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়-নির্ব্বাচিত পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত গ্রন্থরাজী অধ্যয়নে তাঁর আকাঙ্খা জন্মে। বার্ক, মিল্টন, অ্যার্নল্ড, এডিসন, সেক্সপীয়র, গিবন প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থকারগণের অমূল্য গ্রন্থসম্পদপাঠে তাঁর কিশোর মন তাঁর বয়সের অনুপাতে অধিকতর পুষ্ট হওয়ার অবকাশ পায়। এই সময়েই ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ স্থায়িত্ব লাভ করে। *

* P. 9, "Life of Late Babu Ambikacharan."

"কলেজে অধ্যয়ন"

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতা গমন করেন। * বৃত্তিপ্রাপ্তের তালিকায় তাঁর নাম ছিল। অতঃপর প্রসিদ্ধ প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং ঋষিতুল্য প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর সরল জীবন-যাত্রার অন্তর্ব্বর্ত্তী সাংস্কৃতিক উচ্চতা অম্বিকাচরণকে মুগ্ধ করল। সরকার মহাশয়কে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। দ্বিতীয় বর্ষের মাঝামাঝি তিনি রোগশয্যায় শায়িত হয়ে চক্ষুপীড়ায় অত্যধিক যাতনা অনুভব করতে থাকেন। জনৈক ডাক্তার পরামর্শ দিলেন পরিপূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করতে এবং সে বৎসরের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না হওয়ার জন্যে। এই বিপৎকালে তাঁর সহাধ্যায়ী পরেশনাথ দে তাঁকে আশাতীত সাহায্য করেছিলেন। পরেশনাথ বরিশালে অধ্যয়নকালেই তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন। অম্বিকাচরণ অন্ধবৎ পড়ে থাকতেন, পরেশনাথ উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন করতেন— অত্যন্ত মেধাবী অম্বিকাচরণ কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করেই নির্দ্দিষ্ট পাঠ তৈরী করে সেযাত্রা ভরাডুবি হতে রক্ষা পেলেন। কিন্তু কোন প্রকারে অতি সাধারণ ছেলের মত তৃতীয় বিভাগে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কোন বৃত্তিলাভ না করায় প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করতে হোল। তিনি খ্রীষ্টীয় মিশনারী প্রতিষ্ঠিত জেনারেল্ এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে (বর্ত্তমানকালে স্কটিশচার্চ্চেস্ কলেজ নামে অভিহিত) গিয়ে ভর্ত্তী হলেন। ১৮৭৪

---

* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার, ১৮৭০-৭১ সাল, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

সালে বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম বিভাগে অষ্টম স্থান অধিকার করলেন। *

"মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনে শিক্ষকতা"

১৮৭৪ সালে অম্বিকাচরণ মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে ইংরাজীর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এখানে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

* "Life of Late Babu Ambikacharan"র লেখকের উক্তি অনুসারে অম্বিকাচরণ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র না হওয়ার নিমিত্ত কোন ষ্টেট স্কলারসিপ প্রাপ্তির অনুপযুক্ত বিবেচিত হন এবং যে কলেজ হতে ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, মাত্র সেই কলেজের বৃত্তি ও টমসন স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

১৮৭১ সাল অম্বিকাচরণ এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অম্বিকাচরণ ১৮৭৪ সালে জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসন হতে বি-এ পাশ করেন। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার, ১৮৭৪ সাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৪)। উক্ত ইনষ্টিটিউশনে তিনি কোন বৃত্তি অথবা পদক প্রাপ্ত হয়েছিলেন কিনা সেবিষয়ে ১৮৭৪ সালের জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসনের বিবরণপুস্তকটী না পাওয়ার দরুণ সবিশেষ অবগতির উপায় নেই।

১৮৭৫ সালে জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসন হতে অম্বিকাচরণ ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তৃতীয় শ্রেণীতে সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করেন। (ক্যালেণ্ডার, ১৮৭৫-৭৬ সাল)

মহাশয়ের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন এবং মহান্ পুরুষের উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁর স্পষ্টবাদিতা ও সত্যপ্রীতির জন্য তাঁকে স্নেহ করতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি দুর্গামোহন দাসকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে কোপনপ্রকৃতির কারণে অম্বিকাচরণের পক্ষে সামাজিক পদোন্নতি লাভ করা দুঃসাধ্য হবে।

প্রায় এক বৎসর পরে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে অম্বিকাচরণ আইন পড়তে আরম্ভ করেন। ১৮৭৫ সালে মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশনে হেডমাষ্টারের পদটী খালি হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে ঐ পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। এই কর্ম্মে নিযুক্ত থেকেও আইন পড়ার কোন ব্যাঘাত হবে না এই মনে করে তদীয় ইচ্ছাটী তিনি পূর্ণ করলেন। দুইটী বৎসর পরিপূর্ণ কৃতকার্য্যতার সহিত তিনি চাকুরী বজায় রাখলেন। ছাত্রমহলেও তাঁর সুখ্যাতি হয়েছিল। এই বিদ্যালয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁর হৃদ্যতা জন্মে। * সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে ইংরাজীর

* জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—প্রণীত "স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়" শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৪০-৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ ও স্কুল বিভাগে ঐ সময়কার কোন রেকর্ড রক্ষিত নেই। সুতরাং "Life of late Babu Ambikacharan"র লেখকের উপরেই এক্ষেত্রে নির্ভর না করে উপায় নেই। উক্ত বিদ্যায়তনের পূর্ব্বতন নাম ছিল মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশন।

অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মনীষীদ্বয় পরস্পরের চরিত্রমাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হন। উভয়ের চেষ্টায় বিদ্যালয়ে একটী তর্কসভা (debating club) স্থাপিত হয়, এর সভাপতিপদে সুরেন্দ্রনাথ এবং সহকারী সভাপতির পদে অম্বিকাচরণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়েই উভয়ে রাজনীতি আলোচনা সুরু করেন। অম্বিকাচরণ সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। শুনা যায় তিনি নাকি সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর বিপুল ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধেও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথও তখন থেকেই অম্বিকাচরণের মধ্যেই স্বীয় আমরণ জীবনপথের সুহৃদ খুঁজে পেয়েছিলেন। উভয়ের রাজনীতিক্ষেত্রের কর্ম্মাবলী পর্য্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে অম্বিকাচরণ সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং উভয়ের হৃদয়বীণা একটী সুরে বাজত। এই যুগ্ম সৌহৃদ্যের কথা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরবর্ত্তী জীবনে উভয়ের মধ্যে একটা পারিবারিক সম্পর্কের মত অন্তরঙ্গতা হয়েছিল।

পূর্ণ দুই বৎসর অম্বিকাচরণ প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করেছিলেন। তৃতীয় বৎসরে একটা অপ্রীতিকর কারণের উদ্ভব হওয়ায় নিজহস্তে স্বীয় পদত্যাগপত্রটী রচনা করেন। ঐ বৎসরের এন্ট্রান্স ক্লাশে অপেক্ষাকৃত ভাল ছেলের চেয়ে অকৃতী ছাত্রের সংখ্যা অধিক ছিল। সেই কারণে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কম ছেলেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে অনুমতি প্রদান করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে আরও কয়েকটী ছাত্রের নাম পরীক্ষার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হোল। এর ফলে ঐ বৎসরে উক্ত ইনষ্টিটিউসনের

এনট্রান্‌স্‌ পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হতে পারল না। কিছুদিন পরেই বি-এল পরীক্ষার ফল বের হোল, অম্বিকাচরণ উত্তীর্ণের সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। * অনেকে এই হেতু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে মন্তব্য করলেন যে, অম্বিকাচরণ আইন অধ্যয়নে স্বীয় সামর্থ্য ব্যয় করে প্রধান শিক্ষকের কর্ত্তব্যপালনে শৈথিল্য করেছেন, অম্বিকাচরণের এই কথা কর্ণগোচর হতেই তিনি পদত্যাগ করতে সঙ্কল্প করলেন। কিছুদিন পরেই ক্রস তালিকা এলে সকলে অবাক হয়ে নিরীক্ষণ করলেন যে, অম্বিকাচরণের বিষয়টীতে মাত্র পাঁচজন অনুত্তীর্ণ রয়েছে—তাঁর বিষয়টিও ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য হওয়ায় নিতান্ত সহজ ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের ভ্রম স্বীকার করলেন। মাহিনা বৃদ্ধির কথা বলেও পুনরায় উক্ত পদগ্রহণে অম্বিকাচরণের স্বীকৃতি আদায় করা গেল না। বিদ্যা-সাগরের চরণে পতিত হয়ে তিনি আইনজীবীর ব্যবসায় অবলম্বন করার অভিলাষ জ্ঞাপন করে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলেন। অনন্তর ফরিদপুর সহরে নিজের কর্ম্মস্থল নির্ব্বাচন করলেন।

শিক্ষকতাকালে অম্বিকাচরণ কিছুদিন ধরে "চিত্রকর" নামে একটি

---

* অম্বিকাচরণ ১৮৭৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রথম ডিভিশনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিষ্টাণ্ট কনট্রোলার মহোদয় বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উক্ত বৎসরের রোলবহি থেকে পরীক্ষার ফল অবগত হওয়ার সুযোগ প্রদান করে আমায় উপকৃত করেছেন।

বাংলা সাময়িক পত্রের পরিচালনা করেছিলেন। * পত্রিকাটী তদানীন্তন প্রতিষ্ঠাশীল বঙ্গীয় সাংবাদিকগণের শুভদৃষ্টি লাভ করত সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু কোন দুর্দ্দৈববশতঃ এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী উন্নতিশীল সাময়িক পত্রটীকে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। এর কয়েক-দিবস পরে বউবাজারে শ্রীনাথ দাসের লেনে এক বাটীতে অবস্থান কালীন অম্বিকাচরণ স্বগৃহের দ্বিতলে আরোহণ করতে গিয়ে সোপান-চ্যুত হয়ে পতিত হন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে তাঁর মস্তিষ্কে পীড়া ও একপদে পক্ষাঘাত হয়; এই বিকৃত চরণ কখনই সম্পূর্ণ নিরাময় হয় নি। তিনি স্বগ্রামে নীত হয়ে একবৎসর পূর্ণ শয্যাশায়ী

* ১২৮৩ সন, কার্ত্তিকের "চিত্রকর" ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা প্রতাপচন্দ্র রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রচারিত হয়। পত্রিকাটী ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী উলপুর চিত্রকর কার্য্যালয় হতে প্রকাশিত হয় এবং কলিকাতার মুদ্রালয়ে মুদ্রিত হয়। নিয়মাবলীর মধ্যে লিখিত রয়েছে :—

বিনিময়ার্থ ও সমালোচনার্থ পত্রিকা ও পুস্তকাদি এবং প্রবন্ধাদি শ্রীযুক্তবাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার এম-এ, মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের হেডমাষ্টার, ৬২ নং শ্রীনাথ দাসের লেন বহুবাজার, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।"

উক্ত সংখ্যা চিত্রকরের বিষয়সূচীতে, "বেদ", "সখী" "আধুনিক বঙ্গ সমাজ", "নবোদাসীন" ইত্যাদি শিরোণামায় প্রবন্ধ কবিতা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। "বেদ" শীর্ষক প্রবন্ধটী জ্ঞাতব্যবিষয়পূর্ণ এবং

ছিলেন এবং জীবনমরণের সন্ধিস্থলে বিচরণ করেছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার যত্নশুশ্রূষা এবং মাদারীপুরের দীননাথ সেন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে থেকে তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করেন। রোগশয্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহাশীষপূর্ণ একখানি পত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন। *

ক্রমশঃ সমাপ্য। 'সখী' শীর্ষক কবিতাটী হেমচন্দ্রীয় ঢঙে লিখিত হয়েছে, যথা নমুনাস্বরূপ চারিটী পংক্তি—

শুনেছি যখন উষার মিলনে,
বিপিনে বসিয়া বিহঙ্গমগণে
জাগায় জগৎ প্রভাতীয় তানে
বিভুর করুণা প্রকাশ তরে।"

"নবোদাসীন" শীর্ষক নিবন্ধটীতে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তী রীতির কথা মনে হয়।

এই রচনাগুলি কোন লেখকের নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় নি। তখনকার কালের ভাবধারার প্রভাব পত্রিকাটীতে বেশ লক্ষিত হয়। বঙ্কিমযুগের পিউরীট্যান গাম্ভীর্য্য সমস্ত রচনাগুলির বৈশিষ্ট্যরূপে প্রতিভাত হয়। কোন সুষ্ঠু মতবাদ সামনে রেখে রচনাগুলি তৈরী হয়নি।

* বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিত এই পত্রটী নাকি অম্বিকাচরণের গৃহে অনেকদিন পর্য্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। তদীয় কৃতী সন্তানগণ পত্রটীর উপযুক্ত মূল্য বিবেচনায় অক্ষম হয়ে পত্রটীকে কালের কবল হতে রক্ষা করতে কোন প্রচেষ্টা করেন নি।

একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা

অম্বিকাচরণের পঠদ্দশায় একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। "বঙ্গের রত্নমালার" লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী ঘটনার বিবরণ এইরূপ, "ফরিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল অম্বিকাচরণ মজুমদার ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য যখন কলিকাতায় পঠদ্দশায় সানকিভাঙ্গাতে অবস্থান করেন সেই সময়ে একদিন একটী সামান্য ব্যক্তি একটী ব্যাগ হাতে করিয়া উঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহাশয়গণ, আমি একটী টাকার ব্যাগ কুড়াইয়া পাইয়াছি। ইহা বাটী লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি না। কাহার মনে কি আছে কে জানে? আপনারা এই ব্যাগটী রাখিয়া দিন এবং যাহার টাকা তাহাকে যাহাতে পাওয়া যায় তাহার উপায় করুন।" অম্বিকাচরণ ও কালীপ্রসন্ন তাহার নির্লোভতার অনেক প্রশংসা করিলেন ও তাহার সমক্ষে ব্যাগের মধ্যস্থিত টাকা ও নোট গণনা করিতে বসিলেন। গণনান্তে দেখা গেল উহাতে ১১০০০ এগার হাজার টাকা আছে। অম্বিকাচরণ ও কালীপ্রসন্নের হস্তে সমস্ত টাকা রাখিয়া সে যেন নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে চলিয়া গেল। ইঁহারা পরদিন সংবাদ-পত্রে ঘোষণা করিয়া ও পুলিসের সাহায্য লইয়া টাকার যথার্থ অধিকারীর সন্ধান পাইলেন ও সমস্ত টাকা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। যে ব্যক্তি কুড়াইয়া পাইয়াছিল সে পুরস্কার পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই। টাকার যথার্থ অধিকারী হারাধন পাইয়াছে শুনিয়া মহা আনন্দে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল "ভগবন্, আমার জীবন

আজ ধন্য হইল।" (—পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "বঙ্গের রত্নমালা" প্রথম ভাগ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ৪৪ পৃষ্ঠা)

ফরিদপুরে ওকালতী ব্যবসায়

এম্-এ, ও বি-এল পাশ করে এসে অম্বিকাচরণ ফরিদপুর জজকোর্টে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হতে তাঁর এই নূতন জীবন সুরু হোল। তাঁর মত প্রতিভাশালীর পক্ষে এই ক্ষুদ্র সহরে এত ছোট কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে থাকা নিজের দিক দিয়ে একটা বিরাট ত্যাগ বলেই মনে করতে হবে। বাংলাদেশে এরূপ ত্যাগশীলের সংখ্যা বড় বেশী নয়। বাঙ্গালী মনীষীবৃন্দের প্রায় সবারই কর্ম্মের ক্ষেত্র নির্ণীত হয়েছে কলিকাতা রাজধানীতে। কলিকাতার মোহ ছেড়ে স্বীয় জন্মস্থানটিকে উন্নয়নের বাসনা নিয়ে খুব কম মনীষাশালী ব্যক্তিই মফঃস্বলে স্বকীয় কর্ম্মের স্থান বেছে নিয়েছেন। কথায় আছে, তেলে মাথায় তেল দেওয়া। বাংলার ভালো ভালো মস্তিষ্কগুলি তাই কলিকাতায় গিয়ে জড়ো হয়েছে এবং কলিকাতার অস্থিপঞ্জরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদেরকে বিকিয়ে দিয়েছে। গ্রাম থেকে এসে সহরে এবং ছোট সহর থেকে বড় সহরে, বড় সহর থেকে রাজধানীতে সকলের মোহজাল ক্রমান্বয়ে বাঁধা পড়েছে। এর ফলেই কলিকাতার সমৃদ্ধি ধাপে ধাপে এগিয়েই চলেছে, ছোট সহরগুলি তার চেয়ে লঘুগতিতে সমৃদ্ধ হয়েছে, গ্রামগুলি এই অনুপাতেই ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হয়েছে। অম্বিকাচরণ কলিকাতা

ছেড়ে ছোট শহরে কর্ম্মের স্থানটী খুজে নিলেন এ তাঁর পক্ষে একটা অনুপেক্ষনীয় ত্যাগস্বীকার। কিন্তু ফরিদপুর জেলার গ্রাম ও জনপদ তাঁর কাছ থেকে বিশেষ কিছু লাভ করতে পারেনি। তবে সে কথা এস্থলে অবান্তর বলেই মনে হয়।

মফঃস্বলে অবস্থান করে যে কয়জন কৃতী বাঙ্গালী সন্তান সমগ্র ভারতবর্ষে স্বীয় যশঃরশ্মি বিকিরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে নাম নিতে পারি অম্বিকাচরণের। তাঁর পরেই অশ্বিনীকুমার দত্ত, বৈকুণ্ঠ নাথ সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ফরিদপুর উকীল-সভার রত্নস্বরূপ ছিলেন অম্বিকাচরণ, তৎকালীন এই জেলার উকীলদের মধ্যে তাঁর মত তেজস্বী ব্যক্তিত্ব আর কোথাও দৃষ্ট হয়নি। দৃঢ়পণ কর্ম্মশক্তি ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। ফরিদপুরকে তিনি প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতেন। যখন উচ্চতর কর্ম্মক্ষেত্র হতে তাঁর আহ্বান এসেছে, তখনও তাঁর এই প্রীতির সামান্য লাঘব হয়নি। উকীল হিসেবে যখন তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেসময়ে দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি তাঁকে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাক্‌টিশ করার জন্য অনেক অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সংকল্প বিচলিত হয়নি। ("স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ মজুমদারের জীবনী" শীর্ষক প্রবন্ধ, ফরিদপুর হিতৈষিণী, ২২শে ফাল্গুণ, ১৩২৯।)

১৯০৩ এবং ১৯০৪ সালে অম্বিকাবাবু ফরিদপুর উকীল সভার (Faridpur Bar Association) সভাপতি ছিলেন। এই সময়ে তাঁর চেষ্টায় উকীলসভার বর্ত্তমান ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহটী জন্মলাভ করে। এর পূর্ব্বে উকীলসভার আস্তানা ছিল একটি ছোট চালাঘরে এক

বিস্তীর্ণ ময়দানের মধ্যে, যেখানে বর্ত্তমানে একটী হাইস্কুলের (ফরিদপুর ঈশান ইনষ্টিটিউশন) উচ্চ সৌধ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অম্বিকাবাবু উকীলসভার প্রতিষ্ঠা * করেন নি বটে, কিন্তু অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করেছেন। এই সভার নিয়মাবলীর একটা খসরা তিনি প্রস্তুত করেছিলেন ১৯০২ সালে, এই নিয়মাবলীই সামান্য অদল বদল হয়ে এখন পর্য্যন্ত চলে এসেছে। (See P. 44; 'Articles of Association,' published by the Secretary, Faridpur Bar Association, 1929) এই সভাকে এমন একটি স্থায়ী মর্য্যাদা তিনি দান করেছিলেন যার ফলে অন্যান্য জেলার উকীলসভাগুলির মধ্যে এর একটা আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সার্ জন্ উডবার্ণ (Sir John Woodburn) এই সভাকে উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।

---

* ফরিদপুর উকীলসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৫ সালে। এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ঈশান চন্দ্র মৈত্র, প্রসন্নকুমার সান্ন্যাল, কামিনীকুমার মুখার্জ্জী, তারানাথ চক্রবর্ত্তী, দিগম্বর সান্ন্যাল, দীননাথ দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। উকীল সভার প্রয়োজনীয় বৈঠক-গুলি বোসত দিগম্বর সান্ন্যাল মহাশয়ের বাটীতে। জজকোর্টের দালানের কোন অংশও এই সভার সভ্যগণ ব্যবহার করতেন। দিগম্বর সান্ন্যাল প্রভৃতির কয়েকবছর পরে অম্বিকাচরণ ওকালতী আরম্ভ করেন। এই উকীলসভাই ফরিদপুর শহরের রাজনীতি, মিউনিসিপ্যাল। কার্য্যাবলী ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করে এসেছেন। ফরিদপুর শহরটী ধরতে গেলে গড়ে উঠেছে এই উৎসাহ প্রদর্শনের ফলে।

অম্বিকাচরণ নিজে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন এবং এই ব্যবসায়ের স্বাধীনতার যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করেছিলেন, তাই যখন ১৯০২ সালে কাউন্সিলে (Supreme Legislative Council) একটা বিল প্রস্তাবিত হোল, * যা জেলাজজের অধীনস্বরূপে ওকালতী ব্যবসায়ীর আসন নির্দ্দিষ্ট করতে চাইল, তখন তাঁর ধৈর্য্যরক্ষা সম্ভব হোলনা। ফরিদপুরের টাইগার গর্জ্জন করে উঠল। অম্বিকাচরণের প্রচেষ্টায় একটা আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল। কলিকাতার টাউন হলে এক বিরাট সভার আয়োজন হল। মফঃস্বল থেকে বহু ডেলিগেট সভায় যোগদান করল। তীব্র প্রতিবাদ ঘোষিত হল। হাইকোর্টের অনু-

---

"In 1902, a bill was introduced in the Supreme Legislative Council subordinating the Pleaders to the District Judge. Immediately an agitation was set on foot by this Association and its President, Babu Ambikacharan Mazumder who left no stone unturned to avert the impending danger, It was through his energetic endeavours that a monster meeting was convened in the Calcutta Town Hall, which was largely attended by delegates from moffusil Bars. Resolutions were passed strongly protesting against the Bill and urging upon the Government to take the opinion of the High Courts before it accorded its sanction to the Bill. Ultimately not only was the Bill dropped but along with it were removed the objectionable features of the Legal Practitioner's Act " (pp. 46-47 ; 'Articles of Association, as mentioned above.)

মোদন বিনা এ বিল যেন আইনে পরিণত না হয় এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল। এই আন্দোলন বিফল হোল না। বিলটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। অম্বিকাচরণের সহযোগিতাতেই ফরিদপুর উকীল-সভা বিশেষ চেষ্টা করে ১৯১৯ সালে ফরিদপুরে জুরীর বিচার প্রবর্ত্তন করেছিল। ধরতে গেলে জুরীর বিচার ফরিদপুরে অম্বিকাবাবুর একটি দান। *

ফরিদপুর উকীল সভার ইতিহাসে কয়েকটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ১৯০২ সালে গোয়ালন্দ ঘাটে আসামের অবসরপ্রাপ্ত চীফ কমিশনার সার হেন্‌রী কটনকে এই সভার পক্ষ থেকে বিদায় অভ্যর্থনা দান করা হয়। অম্বিকাচরণ এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে ছিলেন। সার হেন্‌রী কটন কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর সমধর্ম্মা নেতা অম্বিকাচরণ তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

১৯১১ সালে ফরিদপুরে যে প্রাদেশিক অধিবেশন হয়, এতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর যোগদানে ফরিদপুরবাসী আপনাকে কৃতার্থ

---

* ১৩৩৭ সালের পৌষসংখ্যা ভারতবর্ষে বীরেন্দ্রনাথ ঘোষলিখিত "অম্বিকাচরণ মজুমদার" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। উপরি উক্ত "Articles of Association"র ৪৭ পৃষ্ঠায় জুরীর বিচার আনয়নে প্রচেষ্টাকারীদের মধ্যে অম্বিকাচরণের নাম প্রদত্ত হয়নি, সেস্থলে উক্ত হয়েছে, ফরিদপুরে জুরীর বিচার ১৯১৯ সনের জানুয়ারী মাস থেকে সুরু হয়। উকীল-সভার সভ্যগণই এবিষয়ে প্রচেষ্টা করেছিলেন।

মনে করেছিল। এই অধিবেশনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অম্বিকাচরণ। ১৯১২ সালে গোখলে প্রাইমারী শিক্ষাবিল সংক্রান্ত প্রচার উদ্দেশে ফরিদপুরে আগমন করেছিলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহযোগিতায় এক সভায় তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। এই গোখলের একজন পরম সমঝদার ছিলেন অম্বিকাচরণ, কারণ উভয়েই মনে প্রাণে মডারেট ছিলেন।

ওকালতী ব্যবসায়ে অম্বিকাচরণের কৃতীত্ব অসাধারণ ছিল। তাঁর বুদ্ধি এত ক্রিয়াশীল ছিল ও এত উপস্থিত প্রয়োজনানুগ ছিল যে, ফৌজদারী বিভাগে তখন তাঁর সমকক্ষ ফরিদপুর জেলায় কেউ ছিল না। হাইকোর্টে ওকালতী করলেও তাঁর এই সুখ্যাতি অটুট থাকত। প্রচুর মেধা ও সুন্দর বাক্‌শক্তি সর্ব্বদা এই ওকালতী ব্যবসায়ে তাঁকে সহায়তা করেছে। তিনি সব সময় আসামীর পক্ষ গ্রহণ করতেন, ফরিয়াদীর পক্ষ নিতেন না। এ তাঁর একটা মূলনীতির মত ছিল। অবশ্য অর্থাগমের সুবিধার জন্যও কতকটা তিনি এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর আইনজ্ঞান সাধারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল না। আইনবিশারদ হিসেবে তাঁর উপরে স্থান পেয়েছিলেন দিগম্বর সান্যাল এবং প্রসন্নকুমার সান্যাল। পরবর্ত্তীকালের পূর্ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ও আইনের খুঁটিনাটী বিষয়গুলির আয়ত্তীকরণে তাঁকে অতিক্রম করেছিলেন। এঁরা সব দেওয়ানী আদালতে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। কিন্তু তাঁর মত বক্তা তৎকালে ফরিদপুরের উকীলসভায় কেউ ছিল না। বর্ত্তমান কালেও নেই। শুধু ফরিদপুর কেন, বাংলাদেশেই তাঁর সমব্যবসায়ীদের মধ্যে বর্ত্তমানে তাঁর মত বক্তা

আছেন কিনা সন্দেহের বিষয়। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনপালের সমশ্রেণীর বক্তা হিসেবে তিনি স্থান পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। এই বক্তৃতাশক্তি তাঁর ওকালতী ব্যবসায়কে খুব স্বল্প আয়াসে দ্রুত উন্নতির পথে চালিত করেছিল। শুনা যায় কোনো মোকদ্দমার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম তিনি কদাচ করতেন না; শুধু ব্যক্তিত্ব, উপস্থিত প্রজ্ঞা এবং বাগ্মিতা-শক্তিবলে তাঁর জয় প্রায় অবধারিত হয়ে থাকত। স্বীয় ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকেও তিনি অবশিষ্ট একটা সময় করে নিতেন বৃহত্তর জগতে বিচরণ করবার জন্য। এই সময়টা তি'নি যাপন করতেন রাজনীতিক চিন্তায় এবং গ্রন্থরাজী পাঠে লিপ্ত থেকে। গ্রন্থপাঠ তাঁর নিয়মিত ছিল। ফরিদপুরে ওকালতী ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বকীয় ব্যবসায়ের দরকারী আইন পুস্তক ছাড়া বাইরের গ্রন্থাধ্যয়নে আসক্তি একমাত্র তিনিই দেখিয়েছিলেন।

সমগ্র এশিয়া মহাদেশে রাসবিহারী ঘোষ মাত্র একজন হতে পেরেছিলেন। বিশ্বের আইন বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান অম্বিকাচরণের কল্পনাতীত ছিল, তবে তাঁর আত্মমর্য্যাদাবোধ ও স্বাধীন তেজোদৃপ্ত মনোবৃত্তি অনেক পরিমাণে অম্বিকাচরণের স্বভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। কাহারও নিকটে আত্মসম্মান বিক্রয় করে অম্বিকাচরণ স্বব্যবসায়ে খ্যাতি অর্জ্জন করতে চেষ্টা করেন নি। সরকারী মহলের দ্বারে দ্বারে আত্মোন্নতির উদ্দেশ্য নিয়ে নূতন উকীলরা তখনকার দিনে টহল দিয়ে বেড়াতেন, এই পদলেহী বৃত্তিকে তিনি অন্তরের অন্তস্তলে ঘৃণা করতেন। তাঁর অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এত গল্প প্রচলিত আছে যে, একমুখে সব বলা যায় না। অনেক গল্পেই তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়েছে যেন

এক অমিততেজা পুরুষ নিজের অমোঘ মনোবলকে সঙ্কুচিত করে ফরিদপুরের মত স্বল্প-পরিসর কর্মক্ষেত্রে রয়ে গিয়েছেন। কয়টি গল্প (যা এখানকার স্থানীয় উকীলদের প্রমুখাৎ শুনতে পেয়েছি) পাঠক-মহলকে উপহার দিচ্ছি।

প্রথম যখন অম্বিকাচরণ প্র্যাক্‌টীস্ আরম্ভ করেছিলেন, সে সময়েই তাঁর একটা অসাধারণ স্বকীয়তা ধরা পড়েছিল। একদিন জেলাজজের আদালতে তাঁর জেরা চলছে, অকস্মাৎ জজসাহেব তাঁর প্রতি কটাক্ষ করে বাধাদান করলেন। অম্বিকাবাবু অপমানিত বোধ করে বসে পড়লেন। তোষামোদ তাঁর ধাতে ছিল না। অতঃপর জজসাহেবের কাকুতিমিনতিতে পুনরায় উঠে দাঁড়িয়ে যথারীতি জেরা করতে লাগলেন। ঘটনা সামান্য, কিন্তু নিষ্ঠাশীল দৃঢ়তার পরিচয় এর মধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে।

"হুজুর" "হুজুর" দাসমনোভাব তাঁর থেকে অনেক তফাতে বাস করত। একদিনকার ঘটনা এইরূপ। তখন অম্বিকাচরণ সবেমাত্র স্বীয় ব্যবসায়ের তক্‌মা ধারণ করেছেন, তাঁর বিপুল খ্যাতি তখন ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রয়েছে। এই তরুণ উকীলের আত্মবিশ্বাসে জেলাজজের ধৈর্য্য লুপ্ত হোল। দুজনে কথা কাটাকাটি, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত ছোট খাটো ঝগড়া হয়ে গেল। অম্বিকাচরণ স্থির নির্ভীক চিত্তে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, "আমার সিদ্ধান্তে আমি নিশ্চয় করে বসে রয়েছি। আপনার প্রয়োজন হয় রেফারেন্‌স্ দেখুন।" জেলাজজ হতবাক্ হয়ে গেলেন। অম্বিকাচরণের সিদ্ধান্তই সত্য প্রমাণিত হোল। উকীল-সভার সিনিয়র উকীলরা তো শুনে তাঁকে ডাকিয়ে সতর্ক করে দিলেন

যে, ভবিষ্যতে এরূপ আচরণ করলে তাঁর ব্যবসায়ের সনদ সরকার-কর্ত্তৃক প্রত্যাহৃত হবে। কিন্তু তাঁর এই সাহসিকতা জীবনের শেষক্ষণ পর্য্যন্তও অবিচল ছিল।

জেলার হাকিম ও জেলাজজ অম্বিকাচরণকে সর্ব্বদা শ্রদ্ধা করে চলতেন। কোন সময়ের জেলা হাকিম বার লাইব্রেরীতে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করতে সসম্ভ্রমে বলে উঠেছিলেন, "আমি একটী সিংহের গহ্বরে (lion's den) প্রবেশ করতে যাচ্ছি।" অম্বিকাচরণ গুরুগম্ভীর হাসিতে এর জবাব দিয়েছিলেন। একবার সওয়াল জবাবের সময় জেলাজজ স্বীয় টেবিলটী অম্বিকাবাবুর কাগজপত্র রক্ষা করবার জন্যে নীচে সরিয়ে রেখেছিলেন। একসময়ে তাঁর স্পর্দ্ধিত উক্তি শুনে জনৈক য়ুরোপীয় বিচারক সোল্লাসে বলে উঠেছিলেন, "আপনি আমায় শুধু আইন শিখিয়েই রেহাই দেবেন না, আমাকে আদব কায়দায় দুরস্ত না করেও ছাড়বেন না দেখছি।" বাস্তবিকই ফরিদপুর বার লাইব্রেরী

---

* এই ঘটনার বিষয়টি অম্বিকাচরণের দ্বিতীয় পুত্র শ্রদ্ধেয় কিরণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকটে প্রাপ্ত হয়েছি।

অপর এক দিবসের ঘটনার বিবরণ এই। অম্বিকাচরণের জেরা চলছে। জজসাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় আর কি। তিনি জোরগলায় বলে উঠলেন, "মজুমদার, আমার সময় বড় অল্প।" অম্বিকাচরণের কণ্ঠ হতে যথার্থ জবাব এল, "আমার সময়ের মূল্য আপনার চেয়ে কম নয়। মাসান্তে আপনার আয় আমার একদিনের তহবিলে ভরে রাখা যায়, এ আপনি বোধ হয় অবগত আছেন।"

তাঁর ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত ছিল। তাঁর নির্ভীকতার একাংশও পরবর্ত্তীকালের উকীলসভার সভ্যেরা দেখাতে পারেন নি। বরঞ্চ তাঁর সময়ে তাঁর দৃষ্টান্ত ও প্রভাবের বশীভূত হয়ে কোন কোন উকীল মোক্তার একটু স্বাধীন-চেতা মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর আর একটী বিশেষ গুণ ছিল, কখনো জুনিয়ার উকীলদের উপরে অনর্থক কাজ চাপিয়ে রাখতেন না, জুনিয়ারদের প্রাক্‌টিস কেমন করে জমতে পারে এবিষয়ে তিনি রীতিমত শিক্ষা দিতেন। তারা বেশ উন্নতি করতে পারে এজন্যে তাঁর অমূল্য উপদেশগুলি তাদের জন্যে প্রস্তুত করে বাখতেন। নিজের প্রাপ্য অর্থের অংশ অনেক নূতন উকীলকে দিয়ে তিনি স্বীয় উদারতা দেখিয়েছেন। তাঁর এই গুণাবলী স্মরণ করলে বর্ত্তমান উকীলসভার শোচনীয় নৈতিক অধঃপতন দেখে স্বভাবতই মনে একটা ধিক্কার আসে। অম্বিকাচরণ জুনিয়র উকীলদের সর্ব্বতো-ভাবে কিরূপে সাহায্য করতেন তার উদাহরণরূপে বহু ঘটনা উল্লিখিত হতে পারে। নমুনাস্বরূপ একটী ঘটনা উপস্থাপিত কর্চ্ছি। কোন মোকদ্দমায় তাঁর তুইজন জুনিয়র নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ তুজনেব ভিতরে বয়ঃকনিষ্ঠ উকীল ছিলেন যিনি তাঁর ফি ধার্য্য হোল একশত টাকা। অগ্রিম ৩৩৲ টাকা তাঁকে প্রদত্ত হোল। সওয়ালজবাবের তারিখ সমাগত হলেও তাঁর প্রাপ্য অর্থ তিনি পেলেন না। একথা অম্বিকাচরণের কর্ণগোচর হতেই তিনি নিজের ফি থেকে উক্ত পরিমাণ অর্থ দান করলেন। (শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মুখার্জ্জী বি, এল, মহাশয়ের নিকটে শ্রুত।)

মক্কেলের ব্যবহার মনোমত না হলে অর্থ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া তাঁর

একটা অভ্যাস ছিল। যতবড় পদস্থ মক্কেল হউন না কেন, তাঁর সাক্ষাতে এলে অভিভূতের মত হয়ে যেতেন। যে ব্যক্তি অর্থকে খোলামকুচির মত দেখতেন তাঁর কৃপাকটাক্ষ লাভ করবার জন্যে কত উমেদার ধন্না দিয়ে পড়ে থাকত। তিনি তাঁর অথই গাম্ভীর্য্যের অটল বেদীতে উপবেশন করে এত নিবিষ্ট থাকতেন যে কেউ তাঁর কাছ থেকে অযথা অনুগ্রহ আদায় করে নিতে সমর্থ হোত না। তাঁর অন্তঃকরণের বাইরের দিকটা কঠিন বর্ম্মে আচ্ছাদিত থাকত। সেখানে ঢুঁ মারে কার সাধ্য। অন্যায় পক্ষপাত লাভ করা সেখানে একান্ত দুরূহ ছিল। তাঁব চরিত্রের এই অংশটী আমাদেরকে প্রাতঃস্মরণীয় সার আশুতোষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ওকালতী ব্যবসাকে যারা জীবনের সারবস্তু বিবেচনা করে থাকে তিনি তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। টাকাপয়সাকে এত তুচ্ছ জ্ঞান করতেন যে বৃহৎ জগতের আহ্বান এলে স্বীয় ব্যবসায়ের কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ে যেতেন। স্থানীয় কংগ্রেস থেকে সভাসমিতি আহূত হোল। এতে তাঁর উপস্থিতির কথা তাঁকে না জানিয়েই হয়ত ঘোষিত হয়েছে—এমনক্ষণে একথা তাঁর গোচর হোল, যখন তাঁর মস্তকের উপরে উচ্চ সামাজিক পদে অধিষ্ঠিত মক্কেলের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে এবং সম্মুখে একটা বড় রকমের অর্থাগমের সূচনা রয়েছে। তখন তখনি উক্ত মক্কেলের দায়িত্ব হাতছাড়া করে বৃহৎকাজে যোগ দিয়েছেন। তাঁর কাছে দেশের কাজের দায়িত্বই ছিল সবচেয়ে বড়ো। অনেক সময়ই অকারণে মক্কেলের সঙ্গে তাঁর বচসা হোত। তিনি গ্রাহ্য করতেন না। কত সাধা অযাচিত অর্থলাভকে তিনি দুহাতে দূরে

সরিয়ে ফেলে রেখেছেন। অবশ্য এর থেকে এই যেন আমরা না বুঝে নিই যে অকিঞ্চনতাই তাঁর কাম্য ছিল। শুধু উদার অন্তঃকরণের দিকটাই দেখাতে চাচ্ছি।

ওকালতী ব্যবসায়ের মর্য্যাদাবোধ তদানীন্তন কালে এই ব্যবসায়ে যাঁরা লিপ্ত ছিলেন তাঁদের বেশ রীতিমতই ছিল, অম্বিকাচরণও এ জিনিষটা খুব হৃদয়ঙ্গম করতেন। একদিন তিনি একেবারে রিক্তহস্ত, বাজার করতে পয়সা অপরের কাছ থেকে ধার করতে হোল। এক ধনী মক্কেল এসে উপস্থিত। সে আটশত টাকা কবুল করল। অম্বিকাচরণ নারাজ। মক্কেলটী গোঁসা হয়ে তাঁর কাছ থেকে চলে গেল। শত অভাবের ভিতরেও এই ব্যবসায়ের গৌরব তিনি কখনো ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। তবে একথাও ঠিক যে তাঁর মত ক্ষমতাবান লোকের পক্ষেই এ সম্ভবপর হোত। অতিরিক্ত আত্মমর্য্যাদাবোধ চিরকাল ক্ষমতার পশ্চাৎগামী হয়েই এসেছে।

ফরিদপুর উকীল লাইব্রেরী সম্মান প্রদর্শনের চিহ্নস্বরূপ তাঁকে অনারারী সভ্যপদ প্রদান করেছিল। * ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় অম্বিকাচরণ এই আন্দোলন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ-

---

* ১৯২০ সাল, ৮ই মে তারিখের উকীল সভার অধিবেশনে একটী প্রস্তাব সমর্থিত হয় যে, অম্বিকাচরণ এসোসিয়েসনের ফি বাবদ কোন অর্থ প্রদান না করেই এসোসিয়েসনের অনারারী সভ্যপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। (Resolution-Book of the Bar Association 1920.)

রূপে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। এই কারণবশতঃ উকীলসভার বিশিষ্ট সভ্যগণ জনসভায় তাঁর প্রতি হীন কটাক্ষ পর্য্যন্ত করতে শঙ্কা-বোধ করেন নি। অম্বিকাচরণ মনে মনে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়ে স্বীয় সভ্যপদ ত্যাগ করে উকীলসভার নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। উকীল-সভার একটী বৈঠকে এই পদত্যাগ পত্রের বিষয়টি সমর্থিত হয়। * মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে বার এসোসিয়েসনের সহিত এইরূপে তাঁর সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়।

গার্হস্থ্য জীবনে অশান্তি

অম্বিকাচরণ পারিবারিক জীবনে ক্ষণিকের তরেও শান্তি পান নাই। সেজদাদার আচরণে এই অশান্তির বীজ রোপিত হয়েছিল। অপর ভাইগণের মধ্যে কৃষ্ণচরণের উপরে তিনি বিরক্ত ছিলেন; কৃষ্ণচরণের চরিত্র অসৎ ছিল। তাঁর উচ্ছৃঙ্খল ভাবগতি তাঁর পুত্র হরলালেও অনুবৃত্ত হয়েছিল। হরলাল মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন এবং

---

* ১৯২১ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখের মিটিংএ এই প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। (Resolution-Book of the Bar Association. 1921)

১৯০২ সালে অম্বিকাচরণ বার এসোসিয়েসনের সভাপতি হয়েছিলেন। আরও কয়েকবার তাঁকে এই এসোসিয়েসনের সভাপতি-পদ প্রদান করা হয়েছিল। (Proceedings of the Bar Association of 1902 ; also of 1917)

ফরিদপুরে অম্বিকাচরণের গৃহে অবস্থান করতেন। তাঁর জন্য তাঁর পিতৃব্যের অন্তর্গ্লানি সীমাতিক্রম করেছিল।

অম্বিকাচরণের বিবাহ কোন সালে সম্পন্ন হয় তা জানা যায় না। তিনি উচ্চকুলীন এবং অতি দরিদ্র বেণীমাধব সেনের দুহিতা বিনোদিনীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। খুলনার মূলঘরে তাঁর শ্বশুরের আবাস ছিল। বিনোদিনী সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং চিঠি-পত্রাদি লিখতে পারতেন। ছোট সংসারের ক্ষুদ্রতার মধ্যে তাঁর দৃষ্টি মোহবদ্ধ ছিল, স্বামীর উচ্চাদর্শকে তিনি সকল অন্তঃকরণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। স্বামী বাইরের জগতে নিজেকে বিস্তারিত করে দিয়ে মশগুল হয়ে থাকতেন, তিনি স্বামীর প্রতি নিরাসক্ত প্রীতি পোষণ করে অন্তর্জগতের ক্ষুদ্রকক্ষে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। উভয়ের মানস মিলন প্রচলিত সংস্কারের গণ্ডীর বাইরে সকলকাম হয়নি। সামন্ততন্ত্রের যুগাবশিষ্ট ভাবধারা এই পরিবারটীকে যে চিরাগত সংস্কারের বেড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছিল তার শক্ত বন্ধনী অম্বিকাচরণের ধমনীতে অটুট ছিল। তাই প্রভু ও আজ্ঞাবহের সম্পর্কের বহির্ভূত ভাবনিবিষ্ট চিন্তারীতি পারিবারিক জীবনেও তাঁর অজ্ঞাত ছিল। অম্বিকাচরণ ও বিনোদিনীর ছয়টী সন্তান হয়, চারু, কিরণ, হেম, সরযুবালা, শৈলবালা এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ প্রতুল। দ্বিতীয় পুত্র কিরণ সম্পূর্ণরূপে পিতার অনুগত হয়ে চলতে অক্ষম হয়ে পিতার বিরাগভাজন হন। তৃতীয় পুত্র হেম সন্তানগণের মধ্যে সর্বাধিক গুণসম্পন্ন ছিলেন, তিনি হাইকোর্টে ওকালতীকালে পিতার বুকে বজ্রশেল নিক্ষেপ করে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে অম্বিকাচরণ শোকাহত হয়ে পড়েন।

অম্বিকাচরণের চিতাভস্মোপরি
নির্ম্মিত স্মৃতিমন্দির

অম্বিকাচরণেব ফরিদপুবস্থ বসতবাটী
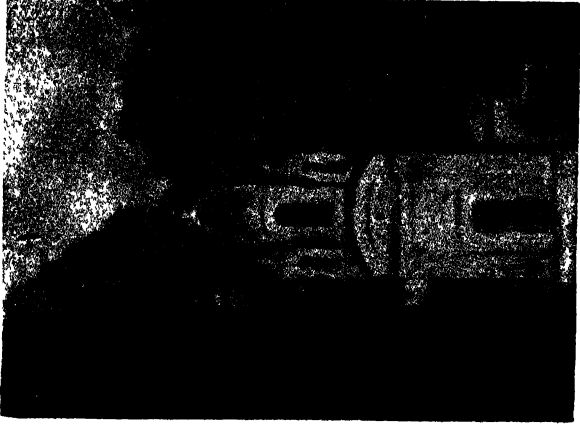
অম্বিকাচরণের পত্নী বিনোদিনীর মৃত্যুতারিখ অবগত হওয়ার কোন উপায় নাই। ১৯০৬ সালে বিনোদিনী দেবী কঠিন রোগাক্রান্তা হয়ে পড়েন। এই রোগেই তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। পত্নীর অসুস্থতার দরুণ ১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রসিদ্ধ বরিশাল কন্‌ফারেন্সে অম্বিকাচরণ উপস্থিত হতে পারেন নি।

ফরিদপুরে জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ

ফরিদপুরে ওকালতী সুরু করেই অম্বিকাচরণ নানাভাবে ফরিদপুরের জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর অদম্য উৎসাহ তাঁর সময়ে একদল আদর্শ কর্ম্মী সৃষ্টি করেছিল। তিনি যেখানে কর্ণধার ছিলেন, সেখানে শত বাধাবিপত্তি এসে তাঁকে তাঁর সঙ্কল্প হতে প্রতি-নিবৃত্ত করতে পারেনি। তাঁর অমোঘ সাহসবলে যে কোন শুভকর্ম্মের অগ্রণী হয়ে তিনি হাল ছেড়ে দিতেন না। ধরতে গেলে একমাত্র তাঁর কর্ম্মশক্তির বলে ফরিদপুরের প্রতিষ্ঠানগুলি সজীব হয়ে উঠতে পেরেছিল। ফরিদপুর সহরটা এক হিসেবে তাঁর কীর্ত্তি। ফরিদপুরের মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। ফরিদপুর জেলার শিক্ষা, রাজনীতি এবং ফরিদপুর সহরের নাগরিক সংস্কৃতিকে তিনি অনেকখানি প্রসারিত করে দিয়েছিলেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফরিদপুর পিপলস্ এসোসিয়েসন (Faridpur People's Association) স্থাপন করেন। এই এসোসিয়েসনের ভিতর দিয়ে তিনি ও তাঁর সহকর্ম্মীগণ নানাভাবে কার্য্য করেছিলেন।

এই এসোসিয়েসনটী সম্ভবত ফরিদপুরের সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। শুধু যে রাজনীতিক কর্ম্মধারা অনুসরণ করাই এই প্রতিষ্ঠানটীর লক্ষ্য ছিল তা নয়, যে কোন জনহিতকর কার্য্য করাই এর উদ্দেশ্যরূপে পরিগণিত হয়েছিল। * এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় পোনর বছর যাবৎ অক্লান্ত চেষ্টা ও আন্দোলন দ্বারা অম্বিকাচরণ রাজবাড়ী হতে ফরিদপুর শহর পর্য্যন্ত রেল লাইন বিস্তারের সম্মতি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হতে আদায় করেছিলেন। + ফরিদপুর শহরের সন্নিকটস্থ রেল ষ্টেশনটীর নামকরণ হয়েছিল "ফরিদপুর রেল ষ্টেশন।" পরবর্ত্তীকালে এই নাম পরিবর্ত্তন করে অম্বিকাচরণের নাম অনুসারে ষ্টেশনটীর নামকরণ হয় "অম্বিকাপুর ষ্টেশন।" উক্ত এসোসিয়েসন ভাঙ্গা হয়ে মাদারীপুর পর্য্যন্ত রেল লাইন বিস্তারের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করেছিল। এই চেষ্টা সফল হতে পারেনি।

১৮৮২ সালে সার্প সাহেব (G. Sharp) ফরিদপুর জেলার

---

* ("স্বর্গীয় অম্বিকা মজুমদারের জীবনী" শীর্ষক প্রবন্ধ, ফরিদপুর হিতৈষিণী, ২২শে ফাল্গুন, ১৩২৯।)

+ "পরলোকগত বিখ্যাত জননায়ক অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় ফরিদপুরের অধিবাসী ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল পুরাতন ফরিদপুর স্টেশনটীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নামানুসারে অম্বিকাপুর রাখা হইয়াছে।"

("বাংলায় ভ্রমণ", পূর্ব্ববঙ্গ রেল পথের প্রচার বিভাগ হতে প্রকাশিত ১ম খণ্ড, ১১১-১১২ পৃষ্ঠা)

ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এসেছিলেন। কুব্যবহারের জন্য ফরিদপুরবাসী বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। অম্বিকাচরণ তাঁর বহু অপ্রীতিকর কার্য্যের প্রতিবাদ করেছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে একটু মনোমালিন্য হয়েছিল। বাংলার ছোটলাট * সার রিভার্স টমসন (Sir Rivers Thompson) ফরিদপুর পরিদর্শনার্থে আগমন করেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করতে নবাব মীর মহম্মদ আলী ফরিদপুরে আসেন। নবাব বাহাদুর যখন সার্প সাহেবের ময়দানের ভিতর দিয়ে চলছেন, সে সময় তাঁকে শকট থেকে নামিয়ে অপমান করা হোল। পরদিবস যথাসময়ে ছোটলাট বাহাদুর সকাশে অম্বিকাচরণ নবাবের প্রতি সার্প সাহেবের দুর্ব্যবহারের কথা নিবেদন করলেন। সার্প সাহেব নবাবের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে স্বীয় দোষ স্বীকার করলেন। (P p. 13-14—Life of Late Babu Ambikacharan.)

১৮৮৫ সালে বাংলার মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির নবীন প্রভাত সূচিত হোল। লর্ড রিপনের সময় বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রসারিত হয়। নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে মিউ-নিসিপ্যালিটিগুলিতে করদাতাগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্য লওয়ার ব্যবস্থা হোল এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলিও স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য হোল। অম্বিকাচরণ ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটিকে একটি সুগঠিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেন। সকলে তাঁকে

---

* ইনি বঙ্গদেশের গবর্ণর ছিলেন। (১১৩৩ পৃষ্ঠা, আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান।)

চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করল, তিনি সম্মত হলেন না। তাঁর পরামর্শ অনুসারে ডি, বসু ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হলেন, অম্বিকাচরণ ভাইস্-চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচিত হলেন। এর কয়েক মাস পরে অম্বিকাচরণ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। * (Minute Book of the Faridpur Municipality, ১৮৮৬)। ফরিদপুর জেলায় যখন ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড এবং লোক্যাল-বোর্ডগুলির সৃষ্টি হোল তখন সেই প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুষ্ঠু আকার প্রদান

---

* অম্বিকাচরণ প্রায় কুড়ি বৎসর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে আরূঢ় ছিলেন। তাঁর সময়ে ফরিদপুর সহরের বিবিধ উন্নতি সাধিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটি অফিস, রাস্তায় আলোদানের ব্যবস্থা, শ্মশান-ঘাট, রাত্রিকালে ময়লা পরিষ্কারের দৈনিক ব্যবস্থা তাঁর দ্বারাই সম্ভব হয়। ফরিদপুরের প্রাক্তন জলের কলটীর পিছনেও একটি ইতিহাস আছে। অম্বিকাচরণ কলিকাতায় পলতার জলের কল দেখে বিমোহিত হন। ফরিদপুরে এসে জেলার ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তায় জল ফিল্টারের একটি প্রণালী পরীক্ষা করেন। তারপর তাঁর উদ্যোগে ও জমীদার বিপিনবিহারী রায়ের টাকায় ফরিদপুরের জলের কল এবং জুবিলী ট্যাঙ্ক এই দুইটী জনহিতকর কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিপিনবিহারীর অভিলাষ অনুসারে ধনমণি চৌধুরাণীর নামে জলের কলটীর নামকরণ হয়।

(ফরিদপুর হিতৈষিণী, ২২শে ফাল্গুন, ১৩২৯, "স্বর্গীয় অম্বিকা মজুমদারের জীবনী" শীর্ষক প্রবন্ধ।)

করে স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর অধিকারের মধ্যে নিয়ে আসতে অম্বিকাচরণ, হরবিলাস মুখোপাধ্যায়, দিগম্বর সান্ন্যাল প্রভৃতি প্রভূত চেষ্টা করেন। তাঁরা সম্মিলিত হয়ে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে একখানি আবেদন পত্র নিয়ে উপস্থিত হন। আবেদন পত্রটী গৃহীত হয়। অতঃপর ফরিদপুর জেলাবোর্ডের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত অম্বিকাচরণ কয়েকটি গ্রামে ও মহকুমায় ইতস্তত ভ্রমণ করে জনসভায় বক্তৃতা করেন। (Life of Late Babu Ambikacharan। অম্বিকাচরণ কয়েকবার ফরিদপুর জেলাবোর্ডের সভ্য হয়েছিলেন। *

১৮৮৬ এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। অনাহারে বহুলোকের মৃত্যু হয়। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় যখন ফরিদপুরবাসী ধ্বংসের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়েছিল, সেসময়ে অম্বিকাচরণ মফঃস্বলের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য দলে দলে যুবক স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করেছিলেন এবং লোক মারফত অন্ন ও অর্থ গ্রামে গ্রামে বিতরণ

---

* ১৯০০ সালে যখন অম্বিকাচরণ জেলাবোর্ডের সভ্য ছিলেন, তখন কে, সি, দে, আই, সি, এস জেলাবোর্ডের সভাপতি ছিলেন এবং কামিনীকুমার রায়, উমাচরণ আচার্য্য, মৌঃ আলিমজ্জমান চৌধুরী, আশুতোষ মৈত্র প্রভৃতি জেলাবোর্ডের সভ্য ছিলেন। উক্ত বৎসরের ২৩শে আগষ্ট তারিখে অম্বিকাচরণ পুনরায় সভ্য নির্ব্বাচিত হলেন। (Minute Book of the District Board of 1900)। ১৯০১, ১৯১০, ১৯১১ এবং ১৯১২ সালে অম্বিকাচরণ ফরিদপুর জেলাবোর্ডের সভ্যপদে আসীন ছিলেন। এই বৎসরগুলির মাইনুট বুক দ্রষ্টব্য।

করেছিলেন। ১৯০৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে অম্বিকাচরণের নির্দেশ অনুসারে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদল সহস্র সহস্র বুভুক্ষাক্লিষ্টকে অপরিমিত পথ্য ও সেবাপ্রদানে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হতে রক্ষা করেন।

জেলা রোড্-সেস্ কমিটির (District Road Cess Committee) ভাইস্ চেয়ারম্যান বা সহ-সভাপতি হিসাবে অম্বিকাচরণ জেলার রাস্তা-গুলির উন্নতির চেষ্টা করেন। ফরিদপুর শহরে অনুষ্ঠিত কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর সভাপতি হিসাবে অম্বিকাচরণ ফরিদপুরবাসীকে কৃষি ও শিল্প বিষয়ে সাধ্যমত জ্ঞানদানে সহায়তা করেন। ('Grand old man of East Bengal," a life-sketch, Advance, 29th Dec, 1930.) অম্বিকাচরণ বহু বৎসর যাবৎ ফরিদপুর লোন অফিসের ডিরেক্টর ছিলেন। *

ফরিদপুর সহরের শিক্ষা বিস্তারে অম্বিকাচরণের নাম স্মরণীয় হয়ে

---

* ফরিদপুর লোন অফিসের মাইনুটবুকগুলি অধ্যয়ন করতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাভ করিনি। সেক্রেটারী মহাশয় অনুগ্রহ করে আমাকে নিম্নলিখিত বিবরণদানে সাহায্য করেছেন :—১৮৮৯ সালের ১২ই মে তারিখে অংশীগণের নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভায় অম্বিকা-চরণ ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ঈশান চন্দ্র মৈত্র। ১৯১৭ সালের ৮ই জুলাই তারিখের অংশীগণের নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভায় অম্বিকাচরণ স্বীয় পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন এবং অপরাপর অংশীগণের অনুরোধেও আর ডিরেক্টর পদ গ্রহণে রাজী হন নাই।

থাকবে। * ফরিদপুরের ঈশান বিদ্যালয়ের উচ্চ সৌধ নির্ম্মাণ সম্ভব হয় প্রধানত অম্বিকাচরণ ও নলিনীকান্ত সেন মহাশয়ের চেষ্টায়। ফরিদপুর বঙ্গ বিদ্যালয় (বর্ত্তমানে ফরিদপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় নামে পরিচিত) অম্বিকাচরণের দ্বারা বহুবিধ উপায়ে উপকৃত হয়। অম্বিকাচরণ বহুবৎসর যাবৎ এই বিদ্যালয়ের কমিটির সভাপতি ছিলেন।

ফরিদপুর জেলায় অম্বিকাচরণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ। + এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যে পর্ব্বত পরিমাণ বাধা এসে

---

* (Articles of Association, P, 50)

অম্বিকাচরণ ফরিদপুর বঙ্গ বিদ্যালয়ের কমিটির সভাপতি ছিলেন ১৯০৬, ১৯০৭ এবং ১৯০৯ হতে আরম্ভ করে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত এই কয়েক বছর ধরে। তৎপূর্ব্বে তিনি এই বিদ্যালয়ের কমিটির সভ্য ছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের উক্ত বিদ্যালয়ের মাইনুট-বুক এবং উল্লিখিত বর্ষগুলির মাইনুট-বুক দ্রষ্টব্য।)

+ ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের নামকরণ হয় বাইশরশির জমীদার ৺বাবু রাজেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরীর নাম অনুসারে। তদীয় উত্তরাধিকারী পুত্র রমেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০,০০০৲ টাকা দান করেন এবং মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি ৩০,০০০৲ টাকা দান করেন। তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডানলপ সাহেব, লর্ডসিংহ প্রভৃতিও এই বিষয়ে নানাবিধ সাহায্য প্রদান করেছিলেন। ১৯১৮ সালে, জুলাই মাসে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অম্বিকাচরণ কলেজ কমিটির সভাপতি পদে অধিরূঢ় হন। (১৯১৮ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার দ্রষ্টব্য।)

জুটেছিল, একমাত্র তাঁর মত উদ্যোগী পুরুষসিংহের পক্ষে সে সকল বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছিল। এই সময়ে তাঁর প্রিয়পুত্র হেমের বিয়োগ বেদনা বুকে নিয়ে শিক্ষায়তনটী সংস্থাপনের জন্য যে অসাধারণ চেষ্টা ও মানসিক পরিশ্রম করেছিলেন তিনি, তার মূল্য নির্ণয় করা যায় না। ফরিদপুর হিতৈষিণীর জনৈক লেখকের বর্ণনা এস্থলে উদ্ধৃত করছি।

"অম্বিকাবাবু যে মর্ম্মান্তিক বেদনা বুকে লইয়া ফরিদপুর কলেজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় কেহ এখনও বিস্মরণ হইতে পারেন নাই। প্রাণাধিক কৃতবিদ্য পুত্র হেমচন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি, এল, হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করিয়া নিজ প্রতিভাবলে অতি অল্প সময় মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করা মাত্র দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বৃদ্ধ পিতা, অপরিণতবয়স্কা স্ত্রী এবং অন্যান্য পরিজনবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। আমরা তখন মনে করিয়াছিলাম যে হেমচন্দ্রের সঙ্গে আমরা অম্বিকাবাবুকেও হারাইলাম। এই বৃদ্ধ বয়সে এই দারুণ শোক বুকে লইয়া অম্বিকাবাবু দেশের কাজে ব্রতী হইতে পারিবেন না। প্রাণপ্রতিম পুত্র বিয়োগের পরদিন সহরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অম্বিকাবাবুকে সান্ত্বনা করিতে গেলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি সবই বুঝি, ভুলিবার জন্যও আমি যথেষ্ট চেষ্টা কচ্ছি, কিন্তু আমার বুকের মধ্যে যেন একটা সংগ্রাম চলছে; বুকের ভিতরের সব যন্ত্র আমি সূতা দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধছি, অমনি যেন একটা ঝড় এসে সব বাঁধ ছিঁড়ে দিচ্ছে—আমি আবার বাঁধছি।" সেই মহাপুরুষের এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! ফরিদ-

পুর কলেজ সংস্থাপন জন্য কি দৃঢ় সঙ্কল্প। তখন তাঁহার কি উৎসাহ, কি উদ্যম! পুত্রশোক একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন; কলেজ সংস্থাপনের জন্য যেন সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। দিনরাত্রি ঐ এক ধ্যান, এক জ্ঞান, একই চিন্তা। কোথায় কলেজের উপযোগী স্থান পাওয়া যাইবে, কি করিয়া টাকা সংগ্রহ হইবে, কেমন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের মঞ্জুর (affiliation) পাইবেন ইহাই একমাত্র চিন্তা।......অম্বিকা-বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও ঐকান্তিক যত্নে নানাবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অতি অল্প সময় মধ্যে সহরে প্রথম শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল।" (ফরিদপুর হিতৈষিণী, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ সাল।)

অম্বিকাচরণ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য কি প্রকারে গভর্ণর বাহাদুরের নিকট হতে অনুমতিপত্র লাভ করেছিলেন এ বিষয়ে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। তৎকালীন গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে সাহেব ফরিদপুরে এসে একটি আহূত জনসভায় ঘোষণা করলেন যে, কলেজ সংস্থাপনের নিমিত্ত অনুমতিদান করা তাঁর পক্ষে একান্ত অসম্ভব। অম্বিকাচরণ রোগশয্যায় শুয়ে একথা শুনলেন। লাটসাহেব তো তখন জাহাজঘাটায় নিজের জাহাজের খাসকামরায় বিশ্রাম উপভোগাদি করছেন। এমন সময় বৃদ্ধ সেই জাহাজঘাটায় গাড়ীতে করে গিয়ে উপস্থিত। অপর কোন লোক হলে লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে পারত কিনা সন্দেহ। কিন্তু ভারতবিখ্যাত নেতা অম্বিকাচরণের কথা স্বতন্ত্র। লাট সাহেব দেখা করতে অনুমতি দিলেন। অম্বিকাচরণ কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে যুক্তিজাল এমন

সুন্দর ভাবে বিস্তার করলেন যে, লাট সাহেবের হস্তলিখিত অনুমতিপত্র লাভ করে ফিরে এলেন।

কাউন্সিলে অম্বিকাচরণ

অম্বিকাচরণ বাংলার আইনসভার (Legislative council) সভ্য হয়েছিলেন। ১৯১৭ এবং ১৯১৮ সালে অম্বিকাচরণ কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। অম্বিকাচরণ কাউন্সিলের সভায় যেদিন উপস্থিত থাকতেন, সেদিন তিনি রীতিমত তর্কজালের সৃষ্টি করতেন। তাঁর

---

* ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস হতে গবর্ণমেণ্ট থেকে প্রতি মাসে ২০০৲ টাকা করে গ্র্যাণ্ট লাভ করে। পরবর্ত্তীকালে এই গ্র্যাণ্টের হার ক্রমবর্দ্ধিত হয়। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ জেলার হাকিমকে কলেজ কমিটির সভাপতি পদে বরণ করে নিয়ে সরকার হতে অনেক সুবিধা লাভ করেন। বর্ত্তমানে এই কলেজটী এক প্রকার অর্দ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হতে পারে। শুনা যায় যে অম্বিকাচরণের অন্যরূপ ইচ্ছা ছিল। সরকারের সাহায্য কোনকালে না লওয়া হয় এইরূপ মনোগত অভিপ্রায় তিনি নাকি অনেক সময় ব্যক্ত করতেন। প্রতিষ্ঠাতার বিরাট জাতীয়তাবাদী আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে কলেজ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হচ্ছে এ একটা ক্ষোভের বিষয় বটে। (sexennial report of the college for the period from April 1922 to February 1928.)

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কথনো মৌনতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে চাইত না। কি প্রজাস্বত্ব আইন, কি রাজবন্দীর বিষয়, কি কচুরীপানা ধ্বংসের উপায় আলোচনা, যে কোন প্রয়োজনীয় কথা প্রসঙ্গে তাঁর স্বকীয়তার পরিচয় ফুটে উঠত।

জাতীয় আন্দোলনে অম্বিকাচরণ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি হয় ১৮৮৫ সালে। ১৮৮৫ সাল হতে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে অনেকে কংগ্রেসের ধারাবাহিক ইতিহাসরূপে অভিহিত করেছেন। আজকের দিনে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানরূপে কংগ্রেসের খ্যাতি সর্ব্ববাদিসম্মত। এই জাতীয় মহাসভাকে ডিম্বকোষ হতে শিশুশাবক, ও শিশুশাবক হতে বর্দ্ধিতায়তন

---

* অম্বিকাচরণ প্রজাস্বত্বের বিষয় নিয়ে আলোচনায় যোগদান করেন ১৯১৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের বৈঠকে। (Calcutta Gazette, 9th January, 1918)

১৯১৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের কাউন্সিলের বৈঠকেই কচুরী পানা ধ্বংস সম্বন্ধে তাঁর আলোচনাটী অতি সুন্দর হয়েছিল। তিনি প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছিলেন যে কচুরী পানা ধ্বংস করার উপযোগী উপায় গ্রহণ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ প্রায় উদাসীন। ও ম্যালী (O' Malley) মহোদয় তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন। (Calcutta Gazette, 9th-January, 1918.)

প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদেরকে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। প্রসিদ্ধ হিউম সাহেব ছিলেন এই কংগ্রেসের জনকস্বরূপ, বিখ্যাত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রথম সভাপতির গৌরবাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং সার সুরেন্দ্রনাথ ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত এই কংগ্রেসের কর্ণধার স্বরূপ ছিলেন। তাঁকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের জনকরূপে আখ্যাত করা চলতে পারে। সুপ্রসারিত কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন অম্বিকাচরণ।

কংগ্রেসের জন্মকাল হতে অম্বিকাচরণ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং আরও আগে থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন সুরু হয়েছিল। কংগ্রেসের উদ্ভবের প্রাকালে ১৮৮৩ সালে কলিকাতায় যে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এতে তিনি যোগদান করেছিলেন * এবং তাঁর মনে প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। এই সময়ে তাঁর অন্তরে যে রাজনৈতিক চেতনা লাভ করেছিলেন তা তাঁকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই সম্মেলনের পুরোধা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি।

এর পর ১৮৮৫ সালে ভারতসভা, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন

---

* "It was an unique spectacle and the writer of these pages still retains a vivid impression of the immense enthusiasm and earnestness which throughout characterised the three days' session of the conference and at the end of which everyone present seemed to have received a new light and a novel inspiration." (P. 45, "Indian National Evolution.")

প্রভৃতির উদ্যোগে এই জাতীয় সম্মেলন (Conference) পুনরনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই বছরই বোম্বাইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হোল এবং ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস নূতন পথ ধরে চলতে লাগল।

১৮৮৫ সাল হতে আরম্ভ করে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের নীতি সহ-যোগিতার পথ বেয়ে চলেছিল। এই দীর্ঘকাল ধরে মডারেটরাই কংগ্রেসের পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন। অম্বিকাচরণ মডারেটদলভুক্ত ছিলেন এবং আগাগোড়া মডারেটী আদর্শবাদকে সমর্থন করে এসে-ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর গুরু ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ; এই শিষ্যত্বের মর্য্যাদা তিনিও আমরণ রক্ষা করেছিলেন। তাঁর নিজের কথায় "The real aim of the congress is to attain Self-government within the empire and the destiny of India which it professes to secure is a great Federal Union under the aegis of the British Crown." ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে স্বাধীন ভারতের কল্পনা তাঁর ছিল না। যে মতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, তার থেকে একচুল কোনসময়ে তিনি সরে আসতে চাননি। ভারতের স্বায়ত্তশাসনে যারা আস্থা রাখেনা তাদেরকে তিরি "কুলক্ষণে পাখী" (birds of evil presage") নামে অভিহিত করেছেন। গোখেল, রাণাডে, দাদাভাই নৌরজি প্রভৃতির সগোত্র ছিলেন তিনি। অসহ-যোগিতার স্বপ্ন তাঁর কাছে অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা এই দুই শব্দের পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। ১৮৯৯ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে যে অধিবেশন হয়েছিল, তাতে কংগ্রেসের এই মূলনীতি ঘোষিত হয়েছিল, যে, 'The object of the Indian National Congress shall be

to promote by constitutional means the interests and the well-being of the people of the Indian Empire." এস্থলে "By constitutional means" এই কথাকয়টী প্রণিধান যোগ্য—এর মধ্যেই তখনকার কালের রাজনৈতিক চিন্তাপ্রণালী সূচিত হয়েছে। এই চিন্তাপ্রণালী ৩১ বছর ধরে কংগ্রেসকে অধিকার করে বসেছিল, অম্বিকাচরণ এই মতের গোঁড়া অনুবর্ত্তী ছিলেন, তিনি আর কোনো রাজনৈতিক পন্থায় আস্থাশীল ছিলেন না।

লর্ড কার্জ্জন গভর্ণর জেনারেল হয়ে ভারতবর্ষের তক্তে আরোহণ করেই অনেক অনর্থের সূচনা করেছিলেন, তার মধ্যে বঙ্গবিচ্ছেদ পরিকল্পনা একটী। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হল—এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, তাঁর সহকারী ছিলেন অম্বিকাচরণ, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি। এই সময়ের একটী দিনের স্মৃতি আমাদের জাতির মানসপটে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। সেদিন ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ সাল। বাঙ্গালীর সবুজ প্রাণ নতুন চেতনায় উজ্জীবিত হল, সূর্য্যোদয়ের সাথে তরুণ যুবকের দল বন্দে মাতরম্ গান গেয়ে রাখীবন্ধন উৎসবে মেতে গেল। খণ্ডিত বাংলাকে অস্বীকার করা হোল পথচারীদের বাহুযুগলে "রাখী" বন্ধন করে। অপরাহ্নে ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে বিরাট জনসমাগম ও উৎসাহ সঞ্চার হোল, এই সভায় কবি রবীন্দ্রনাথ, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির শুভাগমন হয়েছিল। মৃতকল্প আনন্দমোহন বসু দ্বাদশ বাহক স্কন্ধে বাহিত হয়ে সভায় যোগদান করলেন। সভা ভঙ্গ হতেই সুরেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ, আশুতোষ চৌধুরী, জে চৌধুরী,

প্রভৃতি নেতৃবর্গ কলিকাতার রাজপথে জনপ্রবাহের অগ্রভাগে নগ্নপদে চলতে লাগলেন; সে এক অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে উঠল। এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব বাংলাদেশে এতদূর ব্যাপ্ত হয়েছিল যে, সাধারণ কৃষক পর্য্যন্ত "স্বদেশী" এই শব্দটীর গভীর ইঙ্গিৎ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল। আজ পর্য্যন্ত কংগ্রেসকর্ম্মীগণ স্বদেশীওয়ালা নামে জনসাধারণের কাছে পরিচিত হয়ে থাকেন। "স্বদেশী" ও "কংগ্রেস" এই দুটী শব্দের প্রতিষ্ঠা সমগ্রদেশে এত অধিক হয়ে গিয়েছে যে, "জাতীয় মহাসভা" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার সাধারণ্যে দুর্ব্বোধ্য বলে প্রতীয়মান হয়। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশের বাণিজ্য অগ্রগতির পথে ছুটল। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ। দেশের প্রাচীন শিল্পবিজ্ঞান, ও জাতীয় ইতিহাস আলোচনার নূতন পদ্ধতি সুরু হল। এই জাতীয় অনুপ্রেরণায় অন্ধ গোঁরামীময় জাতীয়তাবাদ পর্য্যন্ত কায়েমী আসন প্রস্তুত করে নিল নিজের জন্যে। (Pp, 212-219, chap. XXII, "The settled fact," "A Nation in Making by S. N. Banerjee)

১৯০৬ সালে বরিশালে যে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয় এতে অম্বিকাচরণ পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন। ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনকালে মডারেট ও চরমপন্থীদের বিরোধ উপস্থিত হয়—চরমপন্থীদলে ছিলেন তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল প্রভৃতি এবং মডারেটদলে সুরেন্দ্রনাথ, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি নেতৃস্থলভুক্ত ছিলেন। এই বিরোধ এত উৎকট আকার ধারণ করে যে সম্মেলন সফল হতে পারেনি, পরস্পর জুতানিক্ষেপ পর্য্যন্ত এই সম্মেলনের

একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই অধিবেশনে চরমপন্থীদের যে পরাজয় ঘটল পরবর্ত্তীকালে ১৯১৭ সালে এর প্রতিশোধ তারা নিতে পেরেছিল, যখন মডারেটগণ পরাস্ত হয়ে কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক একরূপ ছিন্ন করেছিল। বাংলাদেশের একদল প্রতিনিধি চরমপন্থীদের ব্যবহারে ক্ষোভ প্রকাশ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, এইদলে ফরিদপুরের পক্ষ থেকে অম্বিকাচরণ মজুমদার, মণীন্দ্রকুমার মজুমদার ও কৃষ্ণদাস রায় ছিলেন। অম্বিকাচরণ কোনকালেই চরমপন্থীদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না।

* এই অধিবেশনে গোলযোগের মূল বিষয় ছিল সভাপতি নিয়োগ নিয়ে। চরমপন্থীরা চাচ্ছিল লালা লাজপত রায় সভাপতিপদে মনোনীত হোন, মডারেটগণ স্বকীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে দিতে চাইলেন না। তাঁরা রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি পদে মনোনয়ন করলেন। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সরকারের সহিত সহযোগিতার মার্গে চলতে চাইলেন। চরম-পন্থীরা (Extremists) বয়কট আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনের উপর অধিক জোর দিচ্ছিলেন। মডারেটগণ অতিরিক্ত একগুঁয়েমী দেখিয়ে-ছিলেন। চরমপন্থীগণও অতিশয় অধৈর্য্যবশতই পরাজয় বরণ করেছিলেন। এই সংক্রান্তে আমাদের মনে পড়ে ১৯৩৯ সালের ত্রিপুরী কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের বিরোধের কথা। এই অধিবেশনেও বামপন্থীর পরাজয় হয়েছে বলতে হবে, এবং এর কারণ ধরতে গেলে রাজনৈতিক কূটনীতিজ্ঞান ও ধৈর্য্যের অভাব ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। বর্ত্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে বাম ও দক্ষিণ শব্দ দুইটা অধিক প্রচলিত হয়েছে। ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত মডারেট ও চরমপন্থী এই দুইটা শব্দের প্রচলন ছিল।

বঙ্গবিচ্ছেদ অম্বিকাচরণের বুকে শেলের মত বেজেছিল। লর্ড মর্লি বঙ্গবিচ্ছেদকে "Settled fact" বা নির্দ্ধারিত সত্যরূপে অভিহিত করেছিলেন, এসময়ে ১৯০৮ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসে অম্বিকাচরণ সদম্ভ উক্তি উচ্চারণ করেছিলেন, "বঙ্গবিচ্ছেদ যদি নির্দ্ধারিত সত্যরূপে পরিগণিত হয়, তবে ভারতের এই অসন্তোষবহ্নিও একটী নির্দ্ধারিত সত্যরূপে গণ্য হবে" ("If the partition is a settled fact, the unrest in India is also a settled fact. and it is for Lord Morley and Government of India to decide which should be unsettled to settle the question." Pp. 43-44, "The Congress and The National Movement") সুরেন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়, "স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃগণের মধ্যে অম্বিকাচরণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর জন্মস্থান ফরিদপুরে এবং পূর্ব্ববঙ্গের গ্র্যাণ্ড ওল্‌ড ম্যান বা "বৃদ্ধ সুজন" ছিলেন তিনি। বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে, বাগ্মিতায়, মাতৃভূমির প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় তাঁর জুরী বাংলাদেশের নেতাগণের মধ্যে বড় মেলে না। সামান্য শিক্ষকরূপে তাঁর কর্ম্মজীবন সুরু হয়েছিল। মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনে (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) তিনি আমার সহকর্ম্মী ছিলেন ; গোড়া থেকেই রাজনীতি তাঁকে পেয়ে বসেছিল, এবং এদিকে তাঁর আকর্ষণ বরাবর অনমনীয় ছিল। কংগ্রেসের জন্মের তারিখ থেকে তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সংহতির পথ তিনি প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন।

বঙ্গচ্ছেদ তাঁকে এত পীড়া দিয়েছিল যে, এক সময়ে আমাকে তিনি

বলেছিলেন, বঙ্গচ্ছেদ পরিবর্ত্তিত না হলে তিনি পৈত্রিক ভিটা বিক্রয় করে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস আরম্ভ করবেন। তিনি চব্বিশপরগণায় কিছু জমী কিনতে পর্য্যন্ত আমার পরামর্শ চেয়েছিলেন। ফরিদপুরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে তিনি পরিচালিত করেছিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁর কর্ম্ম-ক্ষমতা এ বিষয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিল। তাঁর প্রভাব এত দৃঢ়মূল হয়েছিল যে এই আন্দোলনের কোন এক সময়ে ছোট লাট বাহাদুর ফরিদপুরে গেলে তাঁর নির্দ্দেশমত রেলওয়ে ষ্টেশনে একটিও কুলী ছিল না, নিম্নতন পুলিশকর্ম্মচারীগুলি মহামান্য ছোট লাটের মুটিয়ার কাজ করে দিয়েছিলো।

ফরিদপুরের কত না কল্যাণ সাধন করেছিলেন তিনি। তাঁর জন্মভূমি তাঁর কীর্ত্তিকে স্মরণ করে রাখবে। কয়েক বছর ধরে ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি; ফরিদপুরের জলের কল তাঁর অবদান। ফরিদপুর কলেজ তাঁর জন প্রীতির কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ। রোগাক্রান্ত ও শয্যাশায়ী হয়ে এবং বিবিধ শোকতাপের মধ্যেও তাঁর কর্ম্মনিষ্ঠা অটুট ছিল। কংগ্রেস জাতীয় দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলেও তিনি আগাগোড়া মডারেটদের সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন এবং এবিষয়ে কখনো তাঁর মনে শঙ্কা অনুভব করেন নি।" (পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯০-২৯১, A Nation in Making; chap, XXV111) ভারতের "বৃদ্ধ সুজন" (Grand old man) আখ্যা লাভ করেছিলেন বোম্বাইর দাদাভাই নৌরজি; তাঁরই মত পূর্ব্ববঙ্গের "বৃদ্ধ সুজন" আখ্যা লাভ করেছিলেন স্বনাম খ্যাত অম্বিকাচরণ মজুমদার, ফরিদপুরবাসীর পক্ষে এ বড় কম গৌরবের কথা নয়।

১৯১১ সালে ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছিল। এর নাম দেওয়া হয়েছিল "The United Bengal provincial conference." বঙ্গচ্ছেদ তখনো রহিত হয়নি, "মিলিত বাংলা" নামের পিছনে বঙ্গভঙ্গের অস্বীকার স্ফুট হয়েছে। এতে "বঙ্গচ্ছেদ" বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন করেন অনাথবন্ধু গুহ; এই প্রস্তাব সমর্থন করেন জে এম সেন গুপ্ত, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, মৌলবী আবুল কাশেম প্রভৃতি। সম্মেলনের সভাপতি পদে মনোনীত হয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন কৃষ্ণদাস রায়। অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন অম্বিকাচরণ মজুমদার। তাঁর অক্লান্ত কর্ম্মশক্তির ফলে এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। ডেলিগেটদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি; কলিকাতা থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ চৌধুরী, ভুপেন্দ্রনাথ বসু, জে চৌধুরী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেমচন্দ্র নাগ, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ফরিদপুর থেকে ডেলিগেট ছিলেন অম্বিকাচরণ মজুমদার, রওশন আলী চৌধুরী ("কোহিনুর" সম্পাদক,) যদুনাথ পাল, পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকার, হেম মুখার্জ্জী, হেমন্ত মুখার্জ্জী, অঘোরনাথ রায়, রাজকুমার চৌধুরী, সতীশচন্দ্র মজুমদার, কালীপ্রসন্ন সরকার (অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট,) কামিনীকুমার রায়, নলিনীকান্ত সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, পূর্ণচন্দ্র মৈত্র, চারুচন্দ্র মজুমদার, অক্ষয়কুমার সেন, দেবেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক প্রভৃতি। এই সময় ঢাকায় স্বতন্ত্র একটী হাইকোর্ট স্থাপনের কথা হচ্ছিল, এই সম্মেলনে সে বিষয়ের বিরোধিতা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সম্মেলনের ১৪ বছর পরে ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে ফরিদপুরে বঙ্গীয়

প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছিল, এতে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত হয়েছিলেন। ফরিদপুরের গৌরব অম্বিকাচরণ তখন আর বেঁচে নেই।

১৯১১ সালে সুরেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণের স্বপ্ন সফল হোল—দিল্লীর দরবারে সম্রাটের আদেশে বঙ্গবিচ্ছেদ রহিত হোল। "নির্দ্ধারিত সত্য" বাস্তবে পরিণত হতে না পারায় অম্বিকাচরণ বোধ হয় সর্ব্বাধিক তৃপ্তি অনুভব করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপযুক্ত ফল প্রসব করল, এতে কেউ যেন মনে করে বসেন না যে, রাজনৈতিক মণীষা মডারেটরাই সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। এই আন্দোলন মাত্র একটী প্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিল, এবং সামান্য ক্ষুদ্র আদর্শ সামনে রেখে প্রসারিত হয়েছিল। এবিষয়ে সাফল্য খুব বড় কিছু হতে পারেনি। তবে এই আন্দোলন থেকে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাজনীতি যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করেছে—ভাবীকালের ব্যাপকতর অন্দোলনগুলি স্বদেশী আন্দোলনের সুপুষ্ট সন্তান মাত্র একথাও যেন আমাদের বিস্মরণ হয়ে না যায়। মিলিত বাংলার স্বপ্নে বিভোর অম্বিকাচরণ প্রভৃতির একটা বিষয় গোচর ছিল না, যে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রদেশবিভাগ করতে হলে নগরের অতিরিক্ত প্রাধান্য রাখা চলতে পারে না। বাংলা দেশের কথাই ভাবুন। বিপুল অজাগর কলিকাতা নগরী ফেঁপে উঠে উঠে গ্রামগুলিকে ও ছোট ছোট নগরগুলিকে গ্রাস করে ফেলছে দিন দিন—"নগর" কলিকাতার জ্যোতিঃ-প্রাখর্য্যে "দীন হীন" মফঃস্বলগুলির মূল্য হ্রাস পেয়ে পেয়ে চলেছে। এসেম্ব্লি নির্ব্বাচনক্ষেত্রেই গ্রাম ও টাউনের কিঞ্চিৎ যোগ ঘটে, কিন্তু মফঃস্বলের দৈন্য আর ঘুচতে চায় না—সিটি বা নগরের অত্যধিক কেন্দ্রীকরণশক্তি স্বীকৃত হয়েছে, নগরের

আভিজাত্য মোহে পড়ে ছোট ছোট সহরগুলি আত্মসচেতন হয়ে দাঁড়াতে পারছে না—তাদেরকে স্বীকার করে কোন প্রচারের সুবিধে নেই। ফলে কলিকাতা নগরীর পাশে জোনাকী পোকার মত অন্তঃসার-শূন্য বিরাট দেশটা হাহাকার করছে। এর সমাধান :সামান্য-ভাবে হতে পারে কলিকাতা ও তদতিরিক্ত বাংলাকে স্বতন্ত্র দুটী প্রদেশে বিভক্ত করে। গণতান্ত্রিক সুব্যবস্থা ও "নগর" ব্যতিরিক্ত সমগ্র দেশের মহিমা সম্বন্ধে সচেতনতা "মিলিত বাংলার" চেয়েও অধিক প্রয়োজনীয় বলে মনে করি।

১৯১৫ সালে অম্বিকাচরণের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "Indian National Evolution (A brief survey of the origin and progress of the Indian National Congress.)" প্রকাশিত হয়। কংগ্রেসের ইতিহাস আলোচনার পক্ষে গ্রন্থখানি অমূল্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাক্-কংগ্রেস ভারতীয় রাজনীতি, কংগ্রেসের উদ্ভব, য়ুরোপীয় ভারত-বন্ধুগণের বিবরণ, সুরাট কংগ্রেসের বিস্তৃত বিবরণ, ভারতীয় রাজনীতির বিবর্ত্তনালোচনা থাকায় গ্রন্থখানির মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরণের বই আমাদের দেশে খুব কমই লিখিত হয়েছে। লেখক এই সঙ্গে কিঞ্চিৎ আত্মজীবনী জুড়ে দিলে ভালো করতেন, যেমন সুরেন্দ্রনাথ তাঁর "A Nation in Making" গ্রন্থে আত্মচরিত দিয়ে গিয়েছেন। তাহলে বইখানি আরো উপভোগ্য হোত; লেখক তো শুধু গ্রন্থকর্ত্তাই নন, নিজে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য আসন দান করতে কোন সঙ্কোচ করেনি, এস্থলে তাঁর পক্ষে আত্মচরিত প্রকাশ করা নিতান্ত

অশোভন হোত না বোধ করি। স্বকীয় মৌন প্রতিভা নিয়ে সামান্য মফঃস্বলে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকে উচ্চ-যশঃশিখরে যিনি উঠতে পেরেছিলেন তাঁকে আত্মস্থ হতে দেখলে দেশবাসী নিজেকে সৌভাগ্যবানই মনে করত। শুনা যায় একখানি আত্মচরিত তিনি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, শেষ করে যেতে পারেননি। সুকৃতী পুত্রগণের কল্যানে এই অসমাপ্ত লেখাগুলিও বাইরের জগতের আলো দেখতে পারলো না, এতে বাঙ্গালীর চিরাচরিত দীর্ঘসূত্রতা-নীতিই অনুসৃত হয়েছে।

১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে অম্বিকাচরণ সভাপতি মনোনীত হন। যে কোন ভারতবাসীর পক্ষে বর্ত্তমান যুগে এর চেয়ে উচ্চতর সম্মান আর কল্পিত হতে পারে না। এই অধিবেশন কংগ্রেসের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে, কারণ এই সময়ে মডারেট-গণ ও চরমপন্থীগণ একত্র পুনর্মিলিত হলেন এবং মোস্‌লেম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা বোঝাপাড়া হোল এবং চুক্তি হল, যা লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলন চেষ্টা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই প্রথম সুরু হল। এর পর দেশবন্ধু-প্যাক্ট, এবং আরও পরবর্ত্তীকালে কংগ্রেসনেতৃগণ- কর্ত্তৃক লীগের সঙ্গে রফার চেষ্টা হয়েছে। এই দিক দিয়ে লক্ষ্ণৌ চুক্তির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী। সভাপতির অভিভাষণ থেকে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করছি। রাজনৈতিক দলাদলী সম্বন্ধে সভাপতি বলছেন, "প্রকৃতির বিবর্ত্তনের মধ্যেই রয়েছে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া। বিরোধ হচ্ছে জীবনের লক্ষণ, যেমন অনাবিল শান্তির মধ্যে মৃত্যুর বীজ লুকিয়ে রয়েছে। পচাডোবার চেয়ে যে নদী

ময়লা বুকে করে নিয়ে বয়ে যায় তার গতিশীলতার দিকেই আমরা চোখ ফেরাই না কি ? রাজনীতি ক্ষেত্রে দলাদলী রয়েছে, তার মধ্য দিয়েই জাতির জীবনীশক্তি প্রকট হচ্ছে।" অস্ত্র আইন সম্বন্ধে বলছেন, এই আইন একটা সমগ্র জাতিকে ক্লীবে পরিণত করেছে, শুধু যে নিজের কাছেই সে হেয় হয়ে গিয়েছে তা নয়, অপর জাতিগুলির বিচারেও সে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। এরপর ভারতরক্ষা আইনের সমালোচনা করেছেন। জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনের প্রস্তাব করেছেন। এই সংক্রান্তে একটি সুন্দর কথা বলেছেন— "Bureaucracy has accomplished its work. It has established order and tranquillity. But it has outgrown itself" "Call it Home rule, call it self-rule, call it Swaraj, call it self-government, it is all one and the same thing, it is representative government." "Home rule", "Self-rule", "স্বরাজ" প্রভৃতি শব্দগুলি আমাদের কাছে অনেক সময় হেঁয়ালীর মত মনে হয়, সুপটু রাষ্ট্রনায়ক কথাগুলির অর্থের কেমন সুন্দর সমন্বয় করলেন। প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অম্বিকাচরণ অতি সচেতন ছিলেন। সভাপতির অভিভাষণে কতগুলি দাবী জানানো হয়েছে, তার প্রথমটী উল্লেখযোগ্য, তা হচ্ছে এই যে "India must cease to be dependency and be raised to the status of a self governing state as an equal partner with equal rights and responsibilities as an independant unit of the empire ;" স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ দাবীই এখানে স্ফুট হয়েছে ; পূর্ণ স্বাধীনতার

ধারণা তখন পর্য্যন্ত কংগ্রেসওয়ালাদের কারু মাথায় ঢুকতে পারে নি। এর পরে মতিলাল নেহেরু ভারতবর্ষের যে শাসনতন্ত্রের খসরা প্রস্তুত করেছিলেন, যা নেহেরু রিপোর্ট নামে পরিচিত হয়েছে, এতেও ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস বা স্বায়ত্তশাসন আমাদের জাতির আদর্শ-রূপে পরিগণিত হয়েছে। গোলমেলে "স্বরাজ" কথাটির অর্থের পিছনে না ছুটে অম্বিকাচরণ প্রচুর ধীশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করে।

১৯১৭ সালে কংগ্রেস-সভাপতি নির্ব্বাচন নিয়ে মডারেট ও চরম-পন্থীদের মধ্যে মতদ্বৈধ হয়। এই সময় ফরিদপুরে ছিলেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়,—সুরেশবাবুর "জীবন প্রবাহ" (২৩৯-২৪০ পৃষ্ঠা) থেকে তখনকার অবস্থাটা বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তিনি লিখছেন, "নরম দলের নেতা সুরেনবাবু প্রভৃতি আসন্ন কলিকাতা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করিতে চাহিলেন মামুদাবাদের রাজাকে

* লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর দু'একটী সারাংশ নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হল :—

(১) স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের জন্য প্রচার কার্য্য চালানো; অবশ্য, নিয়মতান্ত্রিক (constitutional) মার্গ অনুসরণ করে।

(২) শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে ভারতীয় নিয়োগ।

(৩) জুরীর বিচারে জুরীর সংখ্যার অর্দ্ধেক পরিমাণে ভারতীয়-দের গ্রহণ।

(৪) স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন।

এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বহরমপুরের উকীল বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে। আমাদের পক্ষের জিদ্ হইলো এ্যানি বেশান্তকে প্রেসিডেন্ট, রবিঠাকুরকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করার। ইহা লইয়া নানাস্থানে সভাসমিতি হইলো। ফরিদপুরেও একটি মিটিং ডাকা গেলো। অম্বিকা মজুমদার রাগ করিয়া সে মিটিং-এ আসিলেন না। তাঁকে বাদ দিয়া ফরিদপুরে এই বোধ হয় প্রথম রাজনৈতিক সভা এবং এ-ঘটনা থেকেই তাঁর রাজনৈতিক মৃত্যুর সূত্রপাত। শেষে উভয় পক্ষের রফা হওয়ায় এ্যানি বেশান্ত হইলেন প্রেসিডেন্ট, বৈকুণ্ঠবাবু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।" ১৯১৭ সালের পরে সুরেন্দ্রনাথ ও তদনুবর্তীগণের ক্ষমতা আর কংগ্রেসকে স্বপক্ষে টানতে পারেনি। এই সময় থেকেই তাঁরা জনপ্রিয়তা হারাতে লাগলেন এবং নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারের মধ্যে ডুবে গেলেন—অম্বিকাচরণের ললাটলিপিও এঁদের সঙ্গেই গাঁথা হয়ে থাকল।

১৯২১ সালের গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সময় অম্বিকাবাবু কর্ম্মক্ষেত্র হতে দূরে সরে ছিলেন। তাঁর সহকর্ম্মীগণ অনেকে এই কারণে তাঁর থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর একান্ত প্রিয়পাত্র অনেকে এই কারণ বশতই তাঁর প্রতি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তবে সাক্ষাৎ সহানুভূতি না দেখিয়েও এই আন্দোলনকে প্রকারান্তরে অম্বিকাচরণ সহায়তাই করেছিলেন। মফঃস্বলের বহু কর্ম্মীদল তাঁর আশ্রয় ও সাহায্য লাভ করে ধন্য হয়েছিল। অম্বিকাবাবুর একটা প্রধান গুণ ছিল, মুখে যাই বলুন এবং কলমে যাই লিখুন না কেন, তিনি দরদ দিয়ে এই গৃহছাড়া বৈরাগী স্বদেশহিতৈষী কর্ম্মীগণের

অন্তরের পরিচয় বুঝতে চাইতেন। এদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি অনেকে দেখাতে ভয় পেতেন, যেমন তখনকার ফরিদপুরের উকীল মোক্তাররা এবং বিশিষ্ট ভদ্রলোকরা। হতভাগ্যদের শেষ সম্বল ছিল অম্বিকাচরণের আশ্রয় লাভ। তা তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকত। তবে মতবাদের দিক দিয়ে অম্বিকাচরণ ছিলেন গোঁড়া মডারেট, তাঁর মতের সঙ্গে যাদের মত মিলতোনা তাদের তিনি একেবারে অপাংক্তেয় করে রাখতেন। গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনকেও তিনি খুব সম্মানের চক্ষে দেখেন নি। অসহযোগ পন্থায় যারা বিশ্বাস করত তাদেরকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ন্যায্য সম্মান দান করতে পারেন নি, যদিও দেশের কাজে ব্রতী ত্যাগী সন্ন্যাসী কর্মীদলের ত্যাগের দিকটাতে তাঁর সহানুভূতির পরিপূর্ণতাই বিদ্যমান ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না।

---

* অম্বিকাচরণ সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে তাঁর দেশবিশ্রুত গ্রন্থ "Indian National Evolution"এ ২৬২ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'The anarchists in this country will generally be found associated with gangs of robbers and secret assassins with no ulterior political object in view. They are a revised edition of the Thugs and Goondahs of a previous generation with this difference that they have ascended a little higher in the scale of society and have taken to more refined weapons of destruction." আরও বলছেন, "To invest these pests of

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অম্বিকাচরণের নাম উল্লেখ করতেই আমাদের মনে পড়ে লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের কথা এবং বিচার ও শাসন-বিভাগের পার্থক্যীকরণ সম্বন্ধে আলোচনার কথা। বাংলার ইতিহাসে বঙ্গ-চ্ছেদ আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথের একজন প্রধান সহযোগী হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর নিজ বাসভূমি ফরিদপুরে তাঁর দান অতুলনীয় হয়ে রয়েছে। ফরিদপুর শহরকে তিনি অনেকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান দান করেছেন। ফরিদপুর শহরবাসী সেজন্যে তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। ফরিদপুর জেলাকে তিনি কি দিতে পেরেছেন? একটা বিরাট রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা ফরিদপুর জেলাবাসী তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিল। ১৯২১ সালের জাগ্রত ফরিদপুর ১৯০৫ সালের রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ফরিদপুরের জঠরজাত সন্তানতুল্য। ১৯০৫ সাল হতে বঙ্গ-চ্ছেদ রহিত হওয়ার শেষ তারিখ পর্য্যন্ত যে প্রেরণা তাঁর কাছ থেকে ফরিদপুর জেলাবাসী পেয়েছিল তারই পরিণতিস্বরূপ হচ্ছে পরবর্ত্তী আন্দোলনগুলিতে তাদের অদ্ভুত সাড়া প্রদর্শন। তবে পরের যুগের ফরিদপুর জেলা তাঁর

---

society with the title of political offenders is to inspire them with an idea of false martyrdom and to indirectly set a premium upon lawlessness" (কবি রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়," নরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের "ব্রতী" এবং অনুরূপা দেবীর "পথহারা" শীর্ষক উপন্যাসগুলিতে সন্ত্রাসবাদীদের ভ্রান্তপথের বিষয়টাই জোর দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে।)

সমকালীন ভাবধারা অতিক্রম করে অনেক অগ্রবর্ত্তী হয়ে গিয়েছিল একথা স্বীকার করতেই হবে। আর একটি বিষয় উল্লেখ না করলে চলে না, তা হলো এই যে বাগ্মী অম্বিকাচরণের যে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, গণ-সংহতি এবং সংগঠন শক্তির (mass-organisation) নায়ক হিসেবে তাঁর কোন পরিচয় আমরা পাইনি। শুধু তিনিই নন, তৎকালীন প্রায় সকল নেতার সম্বন্ধেই একথা উচ্চারণ করা যেতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, ভূপেন বসু, রমেশ দত্ত, এস্ পি সিংহ—এঁরা কেউ বৈঠকী রাজনীতির বাইরে পদক্ষেপ করেন নি। অম্বিকাচরণ এঁদের দলভুক্ত ছিলেন। ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজনীতি ভারতবর্ষের অভিজাত সম্প্রদায়ের (বিশেষ করে আইনজীবীদের) খুসী ও খেয়ালের বস্তু ছিল। ভারতীয়-রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির এক অধিবেশনে অশ্বিনীকুমার সত্যকথাই বলেছিলেন যে, "বছরে তিন দিন কংগ্রেস করে বা সেই উপলক্ষে কয়েক দিন স্থানে স্থানে সভা করে দেশের যথার্থ উন্নতি হবে না। এ তামাসা মাত্র।" ("মহাত্মা অশ্বিনীকুমার", ১৫৬ পৃষ্ঠা)। বড়দিনের রিক্রিয়েশন এই কংগ্রেস ১৯১৭ সাল হতে অন্যপথে গতি ফিরিয়ে নিতে চাইল এবং ১৯২০ সালে একেবারে পাখা ও ডানা বদ্‌লে নূতনরূপ ধারণ করল, তখন অম্বিকাচরণের মত মডারেট দলভুক্তদের কংগ্রেসী মহলে আর দেখতে পাওয়া গেলনা। তাঁদের দিন তখন ফুরিয়ে এসেছে। "জনহিতায়" শুধু সামান্য শাসন সংস্কার যাচ্ঞা করে কংগ্রেসওয়ালারা আর তৃপ্ত হয়ে থাকল না। তারা গণ সমাজের (অবশ্য মধ্যবিত্তশ্রেণীর ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অতিরিক্ত কোন সমাজ নয়) দুয়ারে ধন্না দিল।

এর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় অম্বিকাচরণ যে নেতৃদলের অন্যতম ছিলেন, তাঁদের চিন্তাধারা নগরবাসী উচ্চ মধ্যবিত্ত (বা বুর্জ্জোয়া) এবং অভিজাত সমাজে আবদ্ধ হয়ে ছিল। তার বাইরের দরজায় কুলুপ আঁটা ছিল, সেখানে ধনীদরিদ্রের সম্পর্ক ছিল উপকারক ও উপকৃতের সম্পর্ক ; অম্বিকাচরণ প্রভৃতির চোখে গণসমাজ বা নিম্নসমাজ ছিল "দয়া"র পাত্র ; সে দয়ায় তাঁরা কোন কার্পণ্য করতেন না। কিন্তু এই "দয়া" যখুনি "দাবী"তে পরিণত হওয়ার সামান্য ইঙ্গিৎমাত্র করেছে, তখুনি তাঁরা পিছিয়ে গিয়েছেন। এদিক দিয়ে বরিশালের অশ্বিনীকুমার তাঁদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। গণসংহতির কথা তাঁর মুখ দিয়েই কংগ্রেস প্ল্যাট্‌ফর্‌মে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল। গণসংগঠনের কোন প্রয়োজনীয়তা অম্বিকাচরণ উপলব্ধি করেন নি। সেই কারণেই তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জেলায় তাঁর প্রভাব অনেকটা অস্তমিত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য একেবারে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল একথা বলছি না। সত্যকথা বলতে গেলে তাঁর পরবর্ত্তী মাদারীপুরের নেতাগণই ফরিদপুরের রাজনৈতিক জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সাধারণের কাছে কিন্তু এঁরা আড়াল হয়ে রয়েছেন। এর কারণ বোধ হয় এই যে এঁরা কেউ সুন্দর বক্তা নন, আর এখন পর্য্যন্ত গলাবাজিই নেতৃত্বের মাপকাঠি হয়ে রয়েছে। সংগঠনশক্তি এখনও আমাদের দেশের নেতৃত্বের পরিচায়ক হয়ে ওঠে নি। এখনও আমাদের দেশের জনসাধারণ বা "mass" "mob"র স্তরে রয়ে গিয়েছে, অন্ততপক্ষে আমাদের রাষ্ট্রনায়করা জনসাধারণকে mob"র মতই অবলোকন করছেন। এর জন্য দায়ী কে? দেশবাসী

না দেশের রাষ্ট্রনেতাগণ ? উভয়েই দায়ী। মহাত্মাগান্ধীর কংগ্রেস সুরেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণের কংগ্রেস থেকে এটুকু অগ্রসর হয়েছে যে বর্ত্তমানে কংগ্রেস বলতে একটা সর্ব্ব-ভারতীয় সুগঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বোঝা যায়। পূর্ব্বে (অর্থাৎ ১৯২১ সালের আগে) ঠিক এরূপ বোঝা যেত না, যদিও নামত একটা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান তখনও ছিল। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত গণসংগঠনে কংগ্রেসকে পাওয়া যায়নি। এদিক দিয়ে, সময় ও কালের প্রভাব অঙ্গীকার করে, অম্বিকাচরণ প্রমুখ নেতাগণের চিন্তাধারার সঙ্কোচকে মার্জ্জনা করা যেতে পারে।

দিল্লীতে ওয়ার—কন্‌ফারেন্সে যোগদান

১৯১৮ সালে দিল্লীতে সমর সম্মেলন (War-Conference, 27th-29th. April) হয়। গত মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ ইংরেজের সহায়তা করতে কোন কার্পণ্য করেনি, এই সহযোগিতাকে আরো ব্যাপকতর করার জন্যই এই সম্মেলন আহূত হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সে সময়ের ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রের উজ্জ্বল রত্নগুলি সায় দিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ, এম্, কে, গান্ধী হতে সুরু করে রাজামহারাজারা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে নিজেদেরকে কৃতকৃতার্থ মনে করেছিলেন। রাজভক্ত ভারতের সে একদিন ! বিভিন্ন প্রদেশ হতে প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন, অম্বিকাচরণও ছিলেন একজন প্রতিনিধি। শুধু তাই নয়, তিনি (Sub-Committee on Resources"র একজন সম্মানিত সভ্য হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের অম্বিকাচরণ ও এই রাজপ্রসাদাকাঙ্খী অম্বিকাচরণের মধ্যে

পার্থক্যটা অনুভব করতে মন্দ লাগে না। বড়লাটের বক্তৃতা দিয়ে সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হয়। বরোদার গাইকোয়ার এবং কাশ্মীরের মহারাজা কর্ত্তৃক দুইটী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটী সমর্থন করতে যেয়ে অম্বিকাচরণ বলেন, "মহামান্য বড়লাটের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের সামনে এমন একটা বিপদের ছায়াপাত হয়েছে যা জগতকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে চলেছে। বৈজ্ঞানিক বর্ব্বরতা য়ুরোপকে গ্রাস করেছে। সমস্ত জাতিগুলির স্বাধীনতা লুপ্ত হতে চলেছে। দুনিয়ার সভ্যতার সঙ্কটকাল আসন্ন। এশিয়া ও ভারতবর্ষের সামনেও যে ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে তা বড় কম ভয়ানক নয়, ইংলণ্ডের ভাগ্য যেমন বিপন্ন হয়েছে, তার সঙ্গে ভারতের অদৃষ্ট যুক্ত থাকায় ভারতের অবস্থাও কম অন্ধকারময় নয়। ......কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটেনকে সাহায্যে উন্মুখ হয়েছে, আমরাও অনুরূপ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সমবেত হয়েছি। ভারতের নৃপতিগণ এপর্য্যন্ত যথেষ্ট তৎপরতা এবিষয়ে দেখিয়েছেন, আমরা কিন্তু এখন পর্য্যন্ত খুব বেশী তৎপর হইনি। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সৈন্য-সংখ্যা ১৪০,০০০ এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মাত্র ছিল। যুদ্ধেও তো অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে। বাকী সৈন্য সংখ্যা কত রয়েছে মহামান্য প্রধান সেনাপতি সে খবর বলতে পারবেন। আর বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কয়দল সেনাই বা সংগৃহীত হয়েছে। এ একটা দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। একশত পঞ্চাশ বছর ধরে এই সমগ্র জাতিটা নিরস্ত্র ও ক্লীবত্বে পরিণত জীববিশেষে দাঁড়িয়েছে। ত্রিশ বছর যাবৎ ভারতীয়েরা সেনাবাহিনীতে অথবা

স্বেচ্ছাসৈন্যরূপে নাম দিতে চেয়েছে। অবশ্য আমার কথায় মহামান্য বড়লাট যেন ভুল বুঝে না বসেন। আমি শুধু দেখাতে চাচ্ছি যে আমরা অনেক সুযোগ হারিয়েছি। আমাদের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ আছে স্বীকার করছি, কিন্তু জার্ম্মানীর পদানত হওয়ার মর্ম্মকথাও আমাদের কাছে খুব অজ্ঞাত নয়।" (P p. 71-73 Proceedings of the war conference, held at Delhi, 1918)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব

অম্বিকাচরণ দুইবার প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন, ১৮৯৯ সালে এবং ১৯১০ সালে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৮ই-২০শে মে তারিখে বর্দ্ধমানে প্রাদেশিক অধিবেশন হয়েছিল। এই অধিবেশনের প্রাক্কালে সাপ্তাহিক পত্রিকা "বেঙ্গলী" লিখেছেন, "ফরিদপুরের নেতৃস্থানীয় উকীল অম্বিকাচরণ আগামী বৃহস্পতিবারে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন। বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার কংগ্রেস দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে পরিচিত। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের গণমত নিয়ন্ত্রিত করে এসেছেন। তাঁর কর্ম্মশক্তি, স্বদেশহিতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং অটল সংকল্প-দৃঢ়তা তাঁর নিমিত্ত দেশের কাছে একটী সুপ্রতিষ্ঠিত আসন তৈরী করে রেখেছে।"

(Bengalee, Saturday. 13 May, 1899) এই সংখ্যা বেঙ্গলীতে সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলি এইরূপে নির্ণীত হয়েছে :—

(ক) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল।

(খ) মফঃস্বলের স্বায়ত্তশাসন মূলক ব্যবস্থা।

(গ) বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থক্য করন।

(ঘ) পুলিশ বিভাগ।

(ঙ) সিভিল সার্ভিস প্রভৃতিতে ভারতীয় নিয়োগের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

নির্ব্বাচিত সভাপতি তাঁর অভিভাষণে দেশের নানা সমস্যার অতি সুন্দর আলোচনা করেন। বিষয় নিরূপণের দিক দিয়ে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাটী খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। এই বক্তৃতার অংশ হতে অবগত হওয়া যায় যে বর্দ্ধমানে আহূত এই কন্‌ফারেন্স বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হয়। অম্বিকাচরণ এই সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। কলিকাতা টাউন হলে অধিবেশনের স্থান নির্ণীত হয়। বাংলার বিভিন্ন জেলা হতে বহু ডেলিগেট এই সম্মেলনে উপস্থিত

* "It was in the cold weather of 1883 and under the happy auspices of an international exhibition that the first Bengal Conference, under the name of the National Conference, was held at the Albert Hall in Calcutta······such was the origin of the Conference and it is to-day the 17th. anniversary of this institution." (p p. 234 —235, Bengalee 20th May, 1899)

হয়েছিলেন। * অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন জমীদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। ভূপেন বসুর প্রস্তাব অনুসারে অম্বিকাচরণ সভাপতির আসন গ্রহণ করলে সম্মেলনের কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হয়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভূপেন বসু অম্বিকাচরণের বিবিধ গুণাবলীর প্রশংসা করে বলেন, "সমগ্র পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে তাঁর চেয়ে কে অধিক-তররূপে নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটা মাতৃভূমির সেবায় ব্যয় করেছেন? তাঁর মত কে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির লোভকে অস্বীকার করে জনগণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এবং অসীম ত্যাগশীলতার মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন? তাঁর কর্ম্মাবলীর তুলনা মিলবে কোথায়?" ("who, more than he, in all Bengal, East and West, has devoted the best part of an active and energetic life in the services of his motherland? Who, more than he, has stood the allurement of office and temptation of power and privilege and has preferred to remain with the people for whom he has fought so valiantly and at such tremendous sacrifices! Whose services are greater than his?" —Bengalee, Sept, 18, 1910)

* ১৯০১ সালে ভাগলপুরে, ১৯০৩ সালে বহরমপুরে, ১৯০৪ সালে বর্দ্ধমানে, ১৯০৫ সালে ময়মনসিংহে, ১৯০৬ সালে বরিশালে, ১৯০৭ সালে পাবনায়, ১৯০৮ সালে বহরমপুরে, ১৯০৯ সালে হুগলীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখ হতে তিন দিন এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। এ, রসুল সাহেব বঙ্গ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। অম্বিকাচরণ একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "স্বদেশী যুগের মত অতি উচ্চ আদর্শের দ্বারা বাঙ্গালীগণ আর কখনও অনুপ্রাণিত হয় নাই।" তাঁর এই কথায় স্পষ্ট উপলব্ধি হয় তাঁর চিত্তের উপরে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব কতখানি বিস্তার লাভ করেছিল।

"স্বদেশী আন্দোলনে অম্বিকাচরণ"

স্বদেশী আন্দোলন শুধুমাত্র কলিকাতায় ও কলিকাতার আশে-পাশে আবদ্ধ ছিল না। পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় ব্যাপকতরভাবে প্রসারলাভ করেছিল। এক ফরিদপুর জেলাতেই অন্যূনপক্ষে এক হাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অম্বিকাচরণ ছিলেন ফরিদপুরের অবিসম্বাদিত নেতা। তাঁর উৎসাহে এক স্থায়ী কর্ম্মীদল একত্র মিলিত হয়েছিল। এই কর্ম্মীদলের নেতা ছিলেন ব্রহ্ম ঘোষ, সমস্ত জেলার আন্দোলন পরিচালনার ভার ছিল তাঁর উপরে। তাঁর পরেই তদানীন্তন বিশিষ্ট কর্ম্মী হিসেবে নাম করতে পারি যদুনাথ পাল মহাশয়ের। পালংএর আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব এঁর উপরে ন্যস্ত ছিল। ফরিদপুরের বহু সভাসমিতির অনুষ্ঠানে ইনি সহায়তা করে-

ছিলেন। তাঁর পরে অতুল মৈত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁর কর্ম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল ফরিদপুর সহরেই। চাঁদা আদায়, ভলান্টিয়ার সংগ্রহ, হ্যাণ্ডবিল ছাপানো, প্রভৃতি সভাসমিতির যাবতীয় কাজ এঁরাই করতেন। সতীশ মজুমদার, যোগেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অম্বিকাবাবুর পার্শ্বচর ছিলেন এবং পরামর্শদাতা ছিলেন। অম্বিকাবাবুর নেতৃত্বে ফরিদপুরের উকীল ও মোক্তারগণ বিশেষভাবে স্বদেশী আন্দোলনকে সহায়তা করেছিলেন। শিক্ষকগণই এবিষয়ে ছিলেন উদাসীন এবং কোনরকমের উৎসাহ তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যেত না। পরবর্ত্তী-কালেও ফরিদপুরের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ জাতীয় জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চেয়েছেন। আমরা কিন্তু জাতির সংগঠন ভার এঁদের উপরে রেখেই নিশ্চিন্ত রয়েছি।

বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন, স্বদেশী দ্রব্যাদি ক্রয় করার হুজুগ এসময়ে এত বেড়ে গিয়েছিল যে ঘরে ঘরে পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যেও স্বদেশী প্রচার চলত। ফরিদপুর হিতৈষিণী (তখনকার পাক্ষিক পত্রিকা) স্বদেশী প্রচারের মুখপত্রের মত ছিল। ১৯০৫ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখের হিতৈষিণী থেকে অংশত উদ্ধৃত করছি, এর থেকে সে সময়ের স্বদেশী আবহাওয়ার পরিচয় খানিকটা অনুমিত হতে পারবে,—

"স্বদেশী জিনিষ। অন্যান্য জিলার ন্যায় ফরিদপুর সদর এবং মফঃস্বলে দেশীয় জিনিষের আদর হইয়াছে; কাটতি বাড়িতেছে, দেশের কাপড়, দেশের জুতা, ছাতি, চিনি, লবণ ইত্যাদি যে যে জিনিষ যতদূর সম্ভব, দেশের উৎপন্ন পাইতে আর কেহ বিদেশী জিনিষ লইতে-ছেন না। হাটবাজারে বিলাতী লবণ বিক্রীর অল্পতা হইয়াছে।

অনেক হাট এবং বাজারে করকচ, সৈন্ধব বিক্রী হইতেছে। ক্রমে ক্রমে হিন্দুমুসলমান অনেকে বিলাতী লবণ ছাড়িয়া করকচ খাইতেছেন কালব চিনির কাটতি কমিয়াছে, বিলাতী কাপড় খরিদবিক্রী অনেক পরিমাণে রহিত হ'য়াছে। ছেলে বুড়ো ভদ্র ইতর সকলেই বিদেশী জিনিষ বর্জ্জনে কৃত সংকল্প হইয়াছে।

এবার পূজায় প্রায় দেশীকাপড় খরিদ বিক্রী হইয়াছে। বালকেরা সন্তোষচিত্তে মোটাধুতি পরিধান করিযাছে। দুর্গামণ্ডপে দেশী মিলের এবং তাঁতের ও 'জোলার কাপড় দেওয়া হইয়াছে, পূজক পুরোহিতগণ সন্তুষ্ট হইয়া উহা গ্রহণ করিয়াছেন। হাটবাজারে, শত শত ছাত্র "বন্দেমাতরম্" রবে স্বদেশের দ্রব্য ব্যবহারে যত্ন পাইতেছেন। অর্থ দিযা বিলাতী জি'নিষের পরিবর্ত্তে দেশী জিনিষ খরিদ করিতেছেন।

অবন্ধন। বিগত ৩০এ আশ্বিন শহরে এবং পল্লীগ্রামে প্রায় সকল শ্রেণীর বালকবৃন্দ হস্তে রাখীবন্ধন করিয়াছেন।...প্রায় কাহারও বাড়ীতে হাঁড়ি জ্বলে নাই। প্রায় লোকেই দুইবেলা ভাত খায় নাই। চিড়া, খৈ, মুড়ি, জলপান কবিযা দিনরাত্রি যাপন করিয়াছে; ৮-১০ বৎসরের বালকেরাও, সমস্তদিন এবং রাত্রিতে ভাত চায় নাই, মাতা খুড়ী, জেঠি কেহ অনুরোধ করিলেও সেদিন রাত্রিতে কেহ ভাত খাইতে স্বীকৃত হয় নাই। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ীতে বাড়ীতে কস্মিন কালেও এই দৃশ্য হয় নাই। এ মৃত জাতিকে কে জীব সঞ্চার করিলেন। বোধহয় ভগবান দীর্ঘকাল পরে পতিত জাতিকে দয়াবর্ষণ ক'রয়াছেন।"

এই সময় ফরিদপুরে এক প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটে। ৩০শে নবেম্বর

(১৯০৫) তারিখের হিতৈষিণীতে প্রকাশিত হয়েছে, "গত ১লা অগ্রহায়ণ বাঙ্গলার ছিন্ন অঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ভাগ্যবিধাতা মান্যবর ফুলার সাহেব ফরিদপুরে আসিয়াছিলেন। বেলা ৫টার সময় ইঁহার বাষ্পীয় যান ফরিদপুর পৌছিয়াছিল, কয়টা বোমধ্বনি হইল। ষ্টেশনে কুলি ছিল না, পুলিশ ও কনষ্টেবলগণ আবশ্যকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকপুরের জমীদার মুন্সী সেরাজুদ্দিন চৌধুরী সাহেব ব্যতীত আর কোন দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান জমীদার ষ্টেশনে উপস্থিত হন নাই। সরকারী কর্ম্মচারী ভিন্ন, বেসরকারী কোন ভদ্রলোক এবার লাটদর্শনে ষ্টেশনে গমন করেন নাই। জমিদার চৌধুরী সাহেব নাকি ঢাকার শ্রীযুক্ত নবাব ছলিমউল্লা সাহেবের মাতুল।

ফরিদপুর টাউনে ৪টি স্কুল আছে, প্রায় ৮ শত ছাত্র, ইহার একটি বালকও টেপাখোলা ষ্টেশনপথে দৃষ্টিগোচর হইল না। কৌতুহলপ্রিয় বালকদিগের এতাদৃশ আত্মসম্মান, স্বদেশবৎসলতা নিতান্ত প্রীতিকর হইয়াছে। ফরিদপুরের ছাত্রসমাজ বিশেষ ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদভাজন।

পল্লীগ্রাম হইতে কতকগুলি কৃষকশ্রেণীর মুসলমানগণ ফরিদপুরে লাট দর্শনে বদন পুষ্টি করিয়াছিল।

ষ্টেশনে পৌছিয়া ঘোটক আরোহণে সহরে পৌছিলেন, সঙ্গে চীফ সেক্রেটারী এবং আর দুইজন সদস্য ছিলেন, এবার আর বহুমূল্য ফিটিং আয়োজন হয় নাই। কালেক্টরি এবং কোতালি থানা সন্নিহিত স্থান ব্যতীত কদলীরোপণ, দেবদারু নির্ম্মিত তোরণ অথবা নিশান সজ্জিত ছিল না। রাত্রিতে লাটবাহাদুর ডাকবাঙ্গলায় অবস্থিতি করিলেন, তাম্বুতে ভোজন স্থানের ব্যবস্থা ছিল। জমিদারদিগের ডালি ছিল না।"

১৯০৫ সালের, ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের হিতৈষিণীতে রয়েছে,—"স্বদেশ সমিতি। ফরিদপুরে স্বদেশজাত বস্ত্রাদির ব্যবহার জন্য স্থানে স্থানে নানাপ্রকার সমিতি হইয়াছে। খানখানাপুর, রাজবাড়ী, গোয়ালন্দ পাংসা প্রভৃতি স্থানে ব্যবসায়ীগণ পরিপূর্ণ সভা হইয়া গিয়াছে, অনেকেই দেশী বস্ত্রাদি ব্যবহারের বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত ভদ্র ইতর সকলেরই এক অভিমত জানা যাইতেছে।"

ভাঙ্গার স্কুলগৃহে একটি সভার বিবরণ উক্ত তারিখের হিতৈষিণী এইরূপ দিচ্ছেন, "ফরিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মীবর বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার এই সভায় আসীন হইবেন, বেলা ১১টার পূর্ব্বে আকাশ পরিষ্কৃত হইল না, ভাঙ্গাবাসী অনুষ্ঠাতৃগণের সকলেই ঘোর বিষণ্ণ হইলেন। অনেকে ব্যাকুল হইয়া বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক অনারেবল বাবু অম্বিকাচরণের নৌকা আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বেলা ১১টার পরে অনারেবল বাবু অম্বিকাচরণ ভাঙ্গা পৌছিলেন। সকলেই আহ্লাদে উৎফুল্ল, আনন্দস্রোতে ভাসমান হইলেন। সদর ঘাটে নৌকা লাগিল, স্কুলের ছাত্রগণ পতাকা হস্তে নিম্নলিখিত জাতীয় সংগীত করিতে করিতে অনারেবল বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়কে উত্তোলন করিলেন।

জাগ ভাই জাগ ডাকিছেন জননী,
কতদিন রবে ঘুমে অচেতন।
চারিদিকে শোন হাহাকারধ্বনি,
উঠিছে সঘনে বিদারী গগন।

ফল শস্য ভরা ছিল যেই ধাম,
অবনী মাঝারে নন্দন সমান।
দাবানলে যেন হয়েছে শ্মশান,
শোভাহীন আজি মরুর মতন।
ধন ধান্য আর মণি রত্নভার,
যেতেছে চলিয়া সপ্তসিন্ধু পার।
বঙ্গবাসী সবে করে হাহাকার
বিদেশী সকলি করিল লুণ্ঠন।

* * *

আর কেন ঘুমে রহিব মগন,
বিরাম আরাম সাজে কি এখন।
কলঙ্ক কালিমা করিতে মোচন
প্রাণ দিয়া সাধ কঠোর সাধন।
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া জীবনে,
শত বিঘ্ন বাধা ঠেলিয়া চরণে।
ধরি গলাগলি হিন্দু মুসলমান,
এস করি মায়ের দুঃখ বিমোচন।

প্রায় আটশত লোক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, জননী জন্মভূমির অঙ্গচ্ছেদে সকলেরই মুখ মলিন, সকলেই বিষাদ কালিমায় নিস্তব্ধভাবে সভার কার্য্য দর্শন করিতেছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা আলোয়ার উদ্দিন খাঁ চৌধুরী সাহেব সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলেন। চতুর্দ্দিক করতালিতে নিনাদিত

হইল। সভাপতির অনুমতি অনুসারে সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশবৎসল বাগ্মীবর অনারেবল বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার সভার উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে সাধারণকে বুঝাইয়া দিলেন।……

অনারেবল বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার দেশী ধুতি, থান, তোয়ালে, গামছা, জামার কাপড়, মুজা ইত্যাদি সভাস্থ সর্ব্বজন সমক্ষে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং তাহা বিলাতী বস্ত্রাদি অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছিল।”

১৯০৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের একটি সভার বিবরণ হিতৈষিণী পত্রিকার মারফৎ পাওয়া যায়। এই সভা ফরিদপুর টাউনেই আহুত হয়েছিল। সভায় পূর্ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে প্রসন্নকুমার সান্ন্যাল (স্থানীয় উকীল) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় বাংলার অঙ্গচ্ছেদ হওয়ার বিরুদ্ধে এবং স্বদেশজাত দ্রব্যের প্রসার বিষযে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯০৬ সালের ২৮শে জানুয়ারী তারিখের হিতৈষিণী পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, মাদারীপুরের হবিগঞ্জ নামক স্থানে গোলাম ময়লা চৌধুরী সাহেবের নিজ ভবনে একটি সভা হয়েছিল। এতে প্রায় সাত হাজার লোক যোগদান করেছিল। এর মধ্যে অনুমান পাঁচ হাজার মুসলমান ছিল। এসভায় বিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। স্বদেশী দ্রব্যের প্রচারার্থে জমিদার সাহেব ও সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। সভায় নিম্নলিখিত সংগীতটী গীত হয়েছিল,

আয় আয় ভাই,
ফুলের মালা পরাইব আজ তোমার গলে.
বড় আশা করে গেঁথেছিরে ভাই,
তোমার গলায় দোলাব বলে।
তুমি হিন্দু ভাইরে, আমি মুসলমান,
তাবলে ক'রনা মান অভিমান,
দুজনে সমান, হয়ে একপ্রাণ,
গাওরে "বন্দেমাতরম্" বলে।

এই সমস্ত বিবরণ পাঠে জানতে পারা যায় যে একটা বিরাট আন্দোলনের ঢেউ ফরিদপুর জেলার সর্ব্বত্র বয়ে গিয়েছিল এবং এর ভবিষ্যৎ ফল সুদূর প্রসারী হয় নি। এই আন্দোলনের প্রভাবেই সুরেশ ব্যানার্জ্জীর মত দেশকর্ম্মীকে এই জেলা জন্মদান করেছিল।

"অম্বিকাচরণের জাতীয় শিক্ষার আদর্শ"

উপযুক্ত শিক্ষা না পেয়ে কোন জাতি উন্নত হতে পারে না। এ একটা অতি পুরাণো সত্য কথা, অম্বিকাচরণ যে যুগে এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, তখনও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি খুব কম লোকেই নজর দিয়েছিলেন। একটা অতি সুন্দর কথা অম্বিকাচরণের লেখনী হতে বেরিয়েছিল, যা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে এবং যার কোন ভাষ্যরচনার দরকার হয় না। Indian National evolution গ্রন্থের ৩৯৮ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, "Nor can the

Indian National Congress have a nobler aim or a higher destiny than the educational regeneration of the multitudinous population, whose interest and well-being it seeks to represent." "Education is the problem of problems before it." (জাতির শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবন করার চেয়ে বড় রকমের আর কোন লক্ষ্য ভারতীয় কংগ্রেসের থাকতে পারে না। কারণ জাতির কল্যাণ ও স্বার্থের দিকেই কংগ্রেস ঝুঁকে রয়েছে।) সর্ব্ব-রকমের সমস্যার চেয়ে শিক্ষাকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অম্বিকাচরণ দিয়েছেন। শিক্ষার প্রকৃতি কিরূপ হওয়া দরকার, কোন্ ছাঁচের মধ্যে ফেলে শিক্ষার রূপান্তর ঘটানো দরকার, তার একটা ক্ষীণ আভাস মাত্র তিনি দিতে পেরেছেন। দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতির মত অনুসায়ী একেবারে বৈদিক-যুগের বা প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকে এযুগে টেনে আনার অযৌক্তিকতা তিনি দেখিয়েছেন। সেকালের ইতিহাস, সেকালের ঐতিহ্য, সেকালের বেদ উপনিষদ যতই কেন মূল্যবান হোক, তারা কতখানি এযুগের উপযোগী সেইটে হিসেব করে নিতে হবে। আর প্রকৃতপক্ষে, মুখে যত বড়াই করি না কেন, আমরা তো প্রাচীন যুগ থেকে অনেকখানি সরে এসেছি। সে কালের সংস্কার আমাদের আছে কতটুকু। মুখে মুখেই আমরা বেদ পূজা করি, বেদের সংস্কার তো আমাদের নেই বললেই হয়। কাজেই প্রাচীনকে আধুনিক সাজে না সাজিয়ে গ্রহণ করা চলবে না। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে একটা অন্ধ স্বাদেশিকতা এসেছিল আমাদের দেশে যা আন্তরিকতার সঙ্গে উনবিংশ শতকের নব্যবঙ্গের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল এবং প্রায় ফোঁটা তিলক

ও গেরুয়ার দ্বারস্থ হয়েছিল। এই অন্ধ স্বাদেশিকতাকে অম্বিকাচরণ ক্ষতিকর বলে বর্ণনা করেছেন। যা প্রাচীন তাই ভাল হবে, যা আধুনিক তাই বর্জ্জনীয় হবে এ ধারণার পিছনে কোন বস্তু জ্ঞান নেই একথাই তিনি প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। একস্থলে বলছেন, "This tendency to reproduce the past without any amendment appears to have been very excessive." (প্রাচীনকে একেবারে না ভেঙ্গেচুরে না পরিবর্ত্তন করে বরণ করে নিতে হবে এরূপ মনোবৃত্তি বড় বেশী দেখা যাচ্ছে।) এরূপ মনোবৃত্তিকে তিনি সহ্য করতে পারেন নি। আবার একেবারে পাশ্চাত্যীকরণকেও তিনি শিক্ষার আদর্শ বলে গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে, "any attempt to Europeanize India would be a great disaster and a failure." একেবারে পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হতে গেলে আমরা বিফল হব। অপর একটা দেশকে একেবারে এই দেশে ছেঁকে নিয়ে আসা সম্ভব হতে পারে না। যেমন সাহেবীয়ানা, তেমনি অতি স্বদেশীয়ানা এর কোনটাই স্বাস্থ্যকর আদর্শরূপে পরিগণিত হতে পারে না। তবে ওদেশের যেটা ভাল তা আমাদের নিতে হবে বৈকী। ওদের কৃষ্টির যেটুকু ভালো তা আমরা গ্রহণ না করলে এযুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতাই আমাদের লাভ হবে না। তাই একস্থলে বলছেন, "No doubt that which is really good in European civilisation and particularly those virtues which have made Europe what it is at the present day ought to be cultivated by our people." য়ুরোপীয়দের সদ্‌গুণগুলি আমরা আয়ত্ত করব যাতে

আমরা ওদের মত উন্নতি করতে পারি। অর্থাৎ অম্বিকাচরণের মতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় সংস্কৃতির অংশবিশেষকে আমাদের উপযোগী করে নিতে হবে—এ দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রাণাডে ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতের মিল রয়েছে। কিন্তু এসবের মধ্যে দিয়ে এদেশীয় ব্যাপকতর সমাজের উপযোগী কোন শিক্ষার আদর্শ এঁরা কেউই উপস্থাপিত করেন নি। নামত গণশিক্ষার কথা এঁরা অনেক-সময় বলেছেন, কার্য্যত গণশিক্ষা কিরূপে সফল হতে পারে তার কোন বাস্তব প্রণালী দিতে পারেন নি। পাশ্চাত্যের আট আনি, প্রাচ্যের আট আনি এইরূপে যোল আনি করে শিক্ষার খতিয়ান তৈরী করতে হবে এ একটা অসম্পূর্ণ কথা মাত্র। প্রাচ্য সভ্যতা বলতে আমরা কি পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপরীত কিছু বুঝি? প্রাচ্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে কোন সাদৃশ্য নেই কি? শুনা যায় নাকি, 'প্রাচ্য আস্তিক, পাশ্চাত্য নাস্তিক। প্রাচ্য সত্ত্বগুণ, পাশ্চাত্য রজোগুণ।' কোন্ বিশ্লেষণের বশে এরূপ অদ্ভুত কথা বেরিয়েছিল বুঝতে পারি না। ইতিহাস সব দেশেই একটা ধারা বেয়েই এগিয়ে চলে—সে ধারা হলো মনুষ্যসমাজের ধারা—এবং সেই সঙ্গে মনুষ্য সমাজের মেরুদণ্ড অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ। মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ইতিহাসকে ধর্ম্ম কতটুকু নিয়ন্ত্রিত করেছে? এবিষয়ে চিন্তা করে দেখলে স্বভাবতই মনে হয়—প্রাচ্যকৃষ্টি ও পাশ্চাত্য কৃষ্টির মূলত কোন পার্থক্য নেই। বাইরের একটা উপরসা :পার্থক্য মাত্র রয়েছে। আমরা ভিতরে না ঢুকে বাইরের আকারগত বৈসাদৃশ্যকে ফলিয়ে তুলে ঢাক পিটাচ্ছি,—পাশ্চাত্য তুই অস্পৃশ্য, প্রাচ্যের ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে

শুচিতা নষ্ট করিস্‌নে। এ প্রচারের কোন অর্থই হয় না। প্রকৃত সমস্যাকে আমাদের চিনে নেওয়া প্রয়োজন। অম্বিকাচরণ ও তাঁর সমধর্ম্মী চিন্তানায়কগণ এই যায়গাতেই মস্ত এক ভুল করে বসেছিলেন।

অম্বিকাচরণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্য পথে বিচরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মত ও বিশ্বাসের দুএকটা কথা এখানে না উল্লেখ করে পারি না। অম্বিকাচরণের দুটো পরিচয় ছিল ; একটা বাইরের, আর একটা ভিতরের পরিচয়। সামাজিক আচার নিয়মের কাছে তিনি আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত মাথা নত করে চলে গিয়েছেন। যিনি লাট-বেলাটের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানা খেতে কোন দ্বিধাবোধ করেন নি, তিনি হিন্দুসমাজে এসে একেবারে বদলে যেতেন। সেখানে তিনি গোঁড়া হিন্দু, তাই শুধু নয়, তিনি জাতে বৈদ্য, এর উপরন্তু তিনি কুলীন। অর্থাৎ হিন্দুর কূপমণ্ডুকতা বলতে যা বুঝায় সবটুকু ষোলআনাই তাঁর ছিল। ব্রাহ্মণবংশের ছেলে—বয়সে ছোট হোক ক্ষতি নেই—সর্ব্বভারতের জনগণমন-অধিনায়কদের অন্যতম এই অম্বিকাচরণ তার চরণে স্বীয় মস্তক রক্ষা করতে একটু সঙ্কোচ অনুভব করতেন না। জাতিভেদ তাঁর সংস্কারে মজ্জাগত ছিল। সাহেবীয়ানাকে নিন্দা করলেও বাহিরে অর্থাৎ চালচলনে কথাবার্ত্তায় তিনি ছিলেন পুরাদস্তর সাহেব, তার প্রমাণ তিনি ইংরেজী যেমন বলতে ও লিখতে পারতেন, তার এককণাও তাঁর মাতৃভাষায় পারতেন না। ভিতরে তিনি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। ভগবদ্বিশ্বাস তাঁর না ছিল এমন নয়, উচ্চকুলের গর্ব্ব তাঁর বেশ ছিল। কোন বৃহত্তর সামাজিক আদর্শ তাঁর মানসপটে স্থান পায়নি। হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণতাকে এতটুকুও তিনি

লঙ্ঘন করে যান নি। তাঁর সমসাময়িক নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ লোকদের এই সঙ্কীর্ণতা ছিল। এবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ তাঁর চেয়ে উন্নততর কক্ষে অবস্থান করতেন। এই মানসিক সঙ্কীর্ণতার দরুণই কোন উচ্চতর শিক্ষার আদর্শ, বিশেষ করে কোন কার্য্যকরী গণশিক্ষার আদর্শ তাঁর কাছ থেকে আমরা পেতে পারিনি।

কর্ম্মময় জীবনের অবসান

১৯১৮ সাল হতে অম্বিকাচরণের কর্ম্মজীবনের প্রায় অবসান হয়। অন্তিমজীবনে শারীরিক ব্যাধিতে বড় ভুগেছিলেন। তার উপর দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত হয়েছিল। যিনি সারা জীবন বিরাট কর্ম্মস্রোতের মধ্য দিয়ে চলে এসেছেন তাঁর পক্ষে এই অলস জীবনযাত্রা অত্যন্ত ক্লেশকর হয়েছিল। এই সময়ে ফরিদপুর কলেজের সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কাজগুলি মাত্র নিজের দায়িত্বে রেখেছিলেন। অবসর বিনোদন ছিল তাঁর সংবাদপত্র ও পুস্তকাদির মধ্যে। নিজে অধ্যয়নে অশক্ত হওয়ায় অপরে তাঁকে সংবাদপত্র এবং গ্রন্থাদি পাঠ করে শোনাত। এর উপরে সামান্য একটু "দাবা" খেলার নেশা ছিল তাঁর। নিজে যে সবসময়ে খেলায় যোগদান করতেন তা নয়, অপরের ক্রীড়ামোদে স্বীয় কুতূহল চরিতার্থ করতেন। ("Last days of Babu Ambikacharan Mazumder," শীর্ষক ইংরাজী প্রবন্ধ, ফরিদপুর হিতৈষিণী, ৩রা আষাঢ়, ১৩৩১)।

১৯২২ সালে তিনি অতিরিক্ত ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন। ২৫শে

ডিসেম্বর তারিখ হতে তাঁর পীড়া গুরুতর আকার ধারণ করে। চারদিন রোগযন্ত্রনা নীরবে সহ্য করে ১৯২২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি ইহজীবনের মোহপাশ ছিন্ন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর পূর্ণ চৈতন্য বর্ত্তমান ছিল। * অম্বিকাচরণের সন্তানগণ দেশবিশ্রুত পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে একটী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

* ফরিদপুর শহরে তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হতে তাঁর আলয়ের সম্মুখস্থ রাস্তার নামকরণ হয় "অম্বিকারোড।" "ফরিদপুর হিতৈষিণী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা রাজমোহন পণ্ডিত মহাশয় তদীয় তিরোধানের পূর্ব্বেই তাঁর নাম অনুসারে স্বকীয় মুদ্রালয়টীর নামকরণ করেন "অম্বিকা প্রেস।", এই পত্রিকার বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীগণের মতানুসারে অম্বিকানামধারিণী হিন্দুদেবীর নাম অনুসারে এই প্রেসের নামকরণ হয়েছে। এবিষয়ে নিশ্চয় করা সুসাধ্য নয়। অম্বিকাচরণ কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করে টাউন হল নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করে যান। অম্বিকা স্মৃতিসভার অনুরোধে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ টাউনহলটীর নামকরণ করেন "অম্বিকামেমোরিয়াল হল।" ১৯২৮ সালে এই অম্বিকাস্মৃতিসৌধের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে পৌরোহিত্য করেন ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়। এই সভায় অম্বিকাচরণের একটী তৈলচিত্র উন্মোচিত হয়।

(Report of the Chairman of the Faridpur Municipality at the opening Ceremony of the Ambika Memorial Hall.)

ফরিদপুর শহরে "অম্বিকা লাইব্রেরী" নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে অম্বিকাচরণের নাম অনুসারে।

"উপসংহার"

ভারতবর্ষের ইতিহাসে উনবিংশ শতকের দান অতুলনীয়। সর্ব্ব বিষয়ে আমরা গত শতাব্দীর নিকটে ঋণী। বিগত শতকের জঠর হতে কয়েকটী অদ্ভুত মনীষার আবির্ভাব হয়েছিল। রাষ্ট্রনৈতিক, সমাজ-নৈতিক প্রভৃতি সকল বিষয়েই এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক প্রস্ফুট হয়েছিলেন। এঁরাই মোহাচ্ছন্ন ভারতকে নব নব মন্ত্রদানে দীক্ষিত করেছেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক গুরু হচ্ছেন সুরেন্দ্রনাথ। তদীয় প্রভাবের বশীভূত হয়ে যে মন্ত্রশিষ্যের দল তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়া-মণ্ডপতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেই অম্বিকাচরণের নাম স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তদানীন্তন রাষ্ট্রনীতি যে সঙ্কোচের অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিল, তার স্বল্প-পরিসর গণ্ডীর বাইরে অম্বিকাচরণ পদক্ষেপ করতে পারেন নি। সামন্ততান্ত্রিক যুগের অবসানে নবযুগের অভ্যুদয়ের সূচনার সঙ্গে যে আত্মসচেতন অতিব্যক্তিতান্ত্রিক সংস্কার সমাজদেহে প্রবেশ লাভ করে, তারই পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাই গতযুগের রাষ্ট্র-নেতাগণের রাষ্ট্রিক আদর্শবাদে। সে-সময়ের বৈশিষ্ট্য তাঁদের মধ্যে ফুটে উঠেছিল স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই। অম্বিকাচরণ তাঁর সময়ের রাষ্ট্রনীতিক জাগরণের একজন পুরোধা ছিলেন একথা স্বীকার করতেই হবে, সেই সঙ্গে ভুলে যাওয়া চলবেনা যে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারগুলির সঙ্কীর্ণতা থেকে তিনি পরিপূর্ণরূপে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি। এ তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। পরিবারতন্ত্রের মোহ, উচ্চকৌলীন্যের

মোহ তাঁর পক্ষে বর্জ্জন করা স্বাভাবিক ছিল না। তাঁর সময়ের ভাব-ধারা ও ভাবাদর্শ সামনে রেখে তাঁর চরিত্রের বিকাশ আলোচনা করলে তাঁর সম্বন্ধে আমরা যথার্থ ধারণা করতে সক্ষম হব।

পরিশিষ্ট

(১) ১৯৩০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখের "এডভান্‌স" পত্রিকায় প্রকাশিত "Grand old man of East Bengal" শীর্ষক প্রবন্ধে নলিনীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী একস্থলে বলেছেন ''The Late Ambika Charan —rather aptly called "The Grand old man of East Bengal'···, in his intellectual eminence, the possession of the great gift of eloquence and devotion to the motherland, stood in the forefront among the leaders of Bengal during the partition days." (বুদ্ধির প্রাখর্য্যে, অদ্ভুত বাগ্মিতায় এবং অপূর্ব্ব দেশ-প্রীতির দিক দিয়ে বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সমকালীন নেতাদের অগ্রগণ্য ছিলেন অম্বিকাচরণ মজুমদার।)

(২) মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর সুরেন্দ্রনাথ জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন, যেখানেই কার্য্যোপলক্ষে তাঁকে যেতে হযেছে, সেখানেই হরতালের অনুষ্ঠান করে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা দেখানো হয়েছে। "A Nation in Making" পুস্তকের ৩৫৩ পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন যে, ফরিদপুরে গেলে তাঁর প্রতি অবজ্ঞাসূচক কোন অনুষ্ঠান করা হয়নি, বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার সম্মানিত অতিথির মর্য্যাদারক্ষার্থে যথোপযুক্ত আয়োজন করেছিলেন। ("Wherever I went on tour the idea of Hartal was started by the Local Non-co-operators. It never came to much anywhere. At Faridpur, it was not seriously thought of by anybody ; there was still living that outstanding personality, Babu Ambika Charan Mazumder,

the Grand old man of East Bengal, the apostle of steady and orderly progress.")

(৩) "A Nation in Making"র গ্রন্থকার অন্যত্র বলেছেন, "আমাদের জাতিকে যারা গড়ে তুলল তাদের এই জাতিগঠনের বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আলোচনা করতে গেলে আমাদেরকে তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অনাথ বন্ধু গুহ, আনন্দ চন্দ্র রায়, কিশোরী মোহন চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে হবে, নইলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।" (৮১ পৃষ্ঠা)

(৪) অম্বিকাচরণকে ফরিদপুরের এবং পূর্ব্ববঙ্গের "Grand old man', (অল্পকথায় G. O. M.) বা বৃদ্ধসুজন নামে আখ্যাত করা হয়েছে। শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত বিরাটকায় বৃদ্ধের চেহারায় এই নামটির যথাযোগ্য প্রয়োগ হয়েছিল। এই নামকরণের পিছনে ছোট একটু ইতিহাস রয়েছে। ফরিদপুর জেলায় জলের কল পরিদর্শন করতে সার্ জন্ উডবার্ণ (Sir John Woodburn) এসেছিলেন। এখানে এসে অম্বিকাচরণের সঙ্গে আলাপ করে তিনি এত চমৎকৃত হয়েছিলেন যে অম্বিকাবাবুকে "Grand old man" আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। তখন থেকেই নাকি এই নামটি চলিত হয়েছিল। ("স্বর্গীয় অম্বিকা মজুমদারের জীবনী" শীর্ষক প্রবন্ধ, ফরিদপুর হিতৈষিণী, ২২শে ফাল্গুন, ১৩২৯)।

(৫) ১৯৪১ সাল, ২৩শে জানুয়ারী তারিখের "পাঞ্চজন্যে" (চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত দৈনিক) চট্টগ্রামে প্রদত্ত ভারতীয় কেন্দ্রীয়

ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্তের এক বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ব্যবস্থাপক সভা-সমিতিতে আমার অভিজ্ঞতা।' এর থেকে জানতে পারা যায়, ১৯১৬ সালে তৎকালীন রাজবন্দীদের বিষয় নিয়ে কাউন্সিলে আন্দোলন করার বিপক্ষে ছিলেন অম্বিকাচরণ। এই বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত হল ; "১৯১৬ ইংরেজীতে আমি প্রথমে বাংলার কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছিলাম।......সেকালে গভর্ণর কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করিতেন। তাই অর্দ্ধ ডজন ব্যক্তিও জোর গলায় তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে সাহস করিতেন না! সেইদিনের পরিস্থিতিতে তখনকার রাজবন্দীদের বিষয়ে আন্দোলনে আমি যোগদান করি। আমার তখনকার (রাজনৈতিক) গুরু ফরিদপুরের স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ মজুমদার একবার আমাকে কাউন্সিলে এসব বিষয়ে আন্দোলন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।" এই বক্তৃতায় অখিলবাবু অম্বিকাচরণকে স্বীয় "রাজনৈতিক গুরু" এই আখ্যা দান করেছেন।

(৬) ১৯১৬ সালের লক্ষ্মৌ কংগ্রেসের সভাপতিপদের জন্য দুই জন প্রার্থী ছিলেন. অম্বিকাচরণ এবং অ্যানী বেশান্ত। উভয়ের নিমিত্ত ভোটগণনা করা হয়। অম্বিকাচরণ জয়লাভ করেন। ("Mrs. Besant stood for the President's chair at the December Congress which was to take place in Lucknow and received a considerable number of votes, but was defeated by Mr. Ambika Charan Mazumder, an ex-schoolmaster from Eastern Bengal, a pleader and a veteran Congressman."

—P. 112 "A History of the Indian Nationalist Movement" by Sir Verney Lovett.)

(৭) ১৯২১ সালের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে অম্বিকাচরণ ফরিদপুর জেলায় একটী ন্যাশনাল লিবারেল এসোসিয়েসন স্থাপন করেন। ১৩২৮ সালের ৫ই পৌষ তারিখের "ফবিদপুব হিতৈষিণী"তে এই এসোসিয়েসন কর্ত্তৃক অম্বিকাচরণের নিজ বাটীতে অনুষ্ঠিত একটী সভার সংবাদ অবগত হওয়া যায়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবেব মর্ম্ম এইরূপ :—

"কংগ্রেস ও খিলাফতের স্বেচ্ছাসেবকগণ যে অসহযোগ আন্দোলন সুরু করেছেন, এই সভা তাহা সমর্থন করে না। এইরূপ আন্দোলনে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রশ্নের বিষয় হয়ে পড়েছে। অপর পক্ষে সরকারকর্ত্তৃক যে দমননীতি অনুসৃত হচ্ছে এই সভা তাহারও অনুমোদন করে না। গবর্ণমেণ্টের দমননীতির উৎকট প্রকাশে অজ্ঞ জনসাধারণ এবং পথচারীগণ পর্য্যন্ত উৎপীড়িত হচ্ছেন। এর চেয়ে আক্ষেপের বিষয় আব কিছুই হতে পারে না। দেশের শান্তি অপসৃত হয়ে গেলে ইংলণ্ডের যুবরাজের প্রতি এদেশবাসীর যথার্থ সম্মান প্রদর্শন ত্রুটীহীন হতে পারবে না, সে বিষয়ে সরকারেব দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।"

(৮) ১৩৩৭ সালের পৌষ সংখ্যা "ভারতবর্ষে" খ্যাতনামা চরিতাখ্যায়ক বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত প্রবন্ধ "অম্বিকাচরণ মজুমদার" এই শিরোণামায় বাহির হয়। এতে রয়েছে, "১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে অম্বিকাচরণ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ফরিদপুরে ওকালতি ব্যবসায় করিতে গমন করেন। তাঁহার চেষ্টায় ফরিদপুর পীপল্‌স এ্যাসোসিয়েসন স্থাপিত হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে ইহাই প্রথম রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে প্রথম জাতীয় রাজনীতিক সম্মেলন হয়। তাহারই পরিণতিস্বরূপ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি লইয়া নিখিল ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেসের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। অম্বিকাচরণ ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের দুইটি সভাতেই যোগদান করিয়াছিলেন। উভয়ত্রই তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল—বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থক্যীকরণ। এই বিষয়ে পরে তিনি, স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ ব্যতীত, অপর সকলের অপেক্ষা অনেক বেশী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।” “তাঁহার চেষ্টায় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরে জুরীর দ্বারা বিচার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ঢাকা বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের প্রতিনিধি স্বরূপ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ লাভ করিয়াছিলেন। দুইবার তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে (?) বর্দ্ধমানে একবার, এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আর একবার।” “১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর তারিখে বঙ্গদেশ ব্যবচ্ছিন্ন হইলে তাহার বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং তদুপলক্ষে যে স্বদেশী আন্দোলনের উৎপত্তি হয়, অম্বিকাচরণ এই দুই আন্দোলনেই যোগদান করিয়াছিলেন। স্বদেশী শিল্প-দ্রব্যের প্রচারার্থে তিনি জেলায় জেলায় ভ্রমণ পূর্ব্বক বহু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদকল্পে কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় অম্বিকাচরণ সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সভাতেই বৃটীশ পণ্য বয়কট করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, ও স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।”

(৯) অম্বিকাচরণ দুইটী প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। শরৎকুমার রায় লিখিত "মহাত্মা অশ্বিনীকুমার" নামক গ্রন্থের ১৯২ পৃষ্ঠায় উক্ত হয়েছে, "১৮৯৫ অব্দ হইতে বঙ্গদেশের নানা নগরে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, গুরুপ্রসাদ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, জগদীন্দ্রনাথ রায়, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বঙ্গের সুসন্তানগণ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন।"

(১০) ফরিদপুর বার এসোসিয়েসন হতে প্রকাশিত বিবরণী পুস্তিকায় অম্বিকাচরণ সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে :—

"The Association can boast of having on its roll an illustrious member who was twice (in 1902 and 1919) returned as a member of the Provincial Legislative Council by the municipalities of the Dacca Division and was twice called upon by his countrymen to preside over the deliberations of the Bengal Provincial Conference held at Burdwan in 1894 and in Calcutta in 1910. To crown all, the Hon'ble Babu Ambica Charan Mazumder was elected President of the memorable session of the Indian National Congress held at Lucknow in December, 1916, a unique honour shown for the first time in the annals of this country to the member of a District Bar by the people of India." (P. 49, Articles of Association:)

এখানে ১৮৯৯ সালের পরিবর্ত্তে ১৮৯৪ সালের উল্লেখ করে এসোসিয়েসন কর্তৃপক্ষ একটী ভুল করেছেন। অম্বিকাচরণ ১৮৯৯ সালে বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন এ পূর্ব্বেই উক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রবন্ধকারও এই ভ্রমে পতিত হয়েছেন।

(১১) সরোজিনী নাইডু ফরিদপুরে এসে এক জনসভায় বলেছিলেন, "আমি অম্বিকাচরণের জন্মস্থানে এসে নিজেকে ধন্য মনে করছি। অম্বিকাচরণ আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। তাঁরা পরস্পরের সহিত এত বেশী অন্তরঙ্গ ছিলেন যে তাঁরা একসঙ্গে খেলতেন, একসঙ্গে খেতেন। এমন কি তাঁরা দুজনে পরস্পর কলহ করতেন। ফরিদপুরের কথা মনে হতেই অম্বিকাচরণের কথা মনে উদিত হয় এবং অম্বিকাচরণের কথা মনে হলে ফরিদপুরের কথা স্বতই স্মরণপথে স্ফুট হয়।"

(Advance, Dec. 29, 1930)

(১২) বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বিষয়ক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ১৯০৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে ফরিদপুর জনসাধারণের পক্ষ হতে অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে একটী আপত্তিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে একটি সমিতি গঠিত হয়। সমিতির সভ্যগণের নাম :—

মথুরানাথ মৈত্র,
অম্বিকাচরণ মজুমদার,
পূর্ণচন্দ্র মৈত্র,
জগবন্ধু ভদ্র,
উমাচরণ আচার্য্য,
কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়,
মৌঃ আছাদজ্জমান।

এই সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়:—

"ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহকে আসামভুক্ত করার যে প্রস্তাব হইয়াছে, ফরিদপুরের জনসাধারণ তাহা অবগত হইয়া ফরিদপুর সহর এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের সকল শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের লোক প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া এই ভয়ানক বিপজ্জনক এবং অবনতিজনক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য হেতুবাদে দৃঢ়ভাবে সম্মানের সহিত আপত্তি করিতেছেন—

(ক) বাঙ্গালা ভাষাই যাহাদের মাতৃভাষা সেই বাঙ্গালী জাতিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের জন্য পৃথক শাসন-কেন্দ্র স্থাপন করিলে বাঙ্গালী জাতির জাতীয়শক্তি হ্রাস করা হইবে।

(খ) পূর্ব্ববঙ্গের অধিকতর উন্নতিশীল জনসাধারণকে কলিকাতার সমুন্নত শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বীকৃত মতেই অনুন্নত আসাম প্রদেশের শাসনাধীন করা কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নহে।

(গ) রাজনীতি সম্বন্ধে বিবেচনা করিলেও পূর্ব্ববঙ্গের জেলা-সমূহ নিজ বঙ্গের এক অংশস্বরূপে বহুকাল হইতে যে সমস্ত মূল্যবান

অধিকার অনুষ্ঠান এবং বহুবিধ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে তাহা হইতে নিঃসন্দেহে তাহারা বঞ্চিত হইবে ইত্যাদি।"

(১৩) অম্বিকাচরণের জীবনদীপ নির্ব্বাণ হওয়ার প্রায় একমাস পরে ১৯২৩ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে একটি শোকসভা হয়। হলটী লোকে পরিপূর্ণ হয়েছিল। সার সুরেন্দ্রনাথ সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হয়ে অম্বিকাচরণ সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতার মর্ম্মকথা এই যে অম্বিকাচরণ স্বদেশী আন্দোলনে একজন অতি বড় নেতার স্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর মত কয়েকজন তেজস্বী জননায়কের চেষ্টাতেই বঙ্গ-বিচ্ছেদ রহিত হতে পেরেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অম্বিকাচরণকে ভুলে গেলে আমরা এই দেশপূজ্য নেতার প্রতি অবিচার করব। (To Mr. Mazumder and to his colleagues belonged the credit of having brought about the modification of the partition which kept the solidarity of Bengal. This was a monumental service for which his countrymen ought to be grateful to him—P. 276, Modern Review, February, 1923.)

(১৪) ফরিদপুর জেলা সমিতির (The Faridpur District Association) ১৩১৪ সালের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণ হতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায় :—

সমিতির উদ্দেশ্য ও গঠন —

"ফরিদপুর জেলাবাসীদিগের মধ্যে নানা প্রকার শিক্ষাবিস্তার, বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে সৌহার্দ্দ, সদ্ভাব, সহানুভূতি এবং একতা সংস্থাপন, জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলশ্রেণীর লোকের জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষা এবং জেলার রাজনৈতিক, সামাজিক শিক্ষা ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় সাধারণের কার্য্য সমবেত ও নিয়ন্ত্রিত (organised) ভাবে পরিচালনা করা জেলা সমিতির উদ্দেশ্য। অনূ্যন একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের যে কোন নর-নারী ফরিদপুর জেলাবাসী হইবেন কিম্বা জেলাবাসী না হইয়াও এই জেলার উন্নতির সহিত যাঁহার প্রকৃত স্বার্থ থাকিবে তিনিই এই সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। কিন্তু যিনি "স্বদেশী" নহেন তিনি কোন অবস্থাতেই ইহার সভ্য হইতে পারিবেন না। প্রত্যেক সভ্যকে বার্ষিক অনূ্যন এক টাকা চাঁদা দিতে হইবে।

জেলা সমিতির সভ্যগণ আপাততঃ নিম্নলিখিত প্রণালীতে নির্ব্বাচিত ও গৃহীত হইয়াছেন ;

যথা—প্রত্যেক থানায় ১০ জন করিয়া ১৪টী থানায় ১৪০ জন।

মাদারীপুর সহর	২ জন।
রাজবাড়ী সহর	২ জন।
ভাঙ্গার সহর	২ জন।
চিকন্দী সহর	২ জন।
গোপালগঞ্জ সহর	২ জন।
ফরিদপুর সহর	২০ জন।
	১৭০ জন।

স্বদেশী আন্দোলন —

"স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন প্রচার সমিতির একটি প্রধান ব্রত। এই স্বদেশী প্রচার ও প্রচলন কল্পে সমিতি:সভ্য ও প্রচারকগণ দ্বারা অনেক কার্য্য করাইয়াছেন। * * 'ফরিদপুর জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী' ও 'স্বদেশী ভাণ্ডার' বিশুদ্ধ স্বদেশী দ্রব্যের আগার; তাহাদের কার্য্য অতীব প্রশংসনীয়। নিভীনসন্ সাহেব "স্বদেশী ভাণ্ডার" পরিদর্শন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অত্রত্য প্রধান প্রধান মহাজনগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার নাথ ও শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু পোদ্দারের কাপড়ের ফারম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। * * * শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর সাহা জেলের কণ্ট্রাক্টর, তিনিও জেলে করকচ যোগাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু বিগত আগষ্ট মাসে জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিলাতী লবণ দিতে হইবে বলিয়া পীড়াপীড়ি করিলে তিনি অকাতরে সে কণ্ট্রাক্ট পরিত্যাগ করেন।"

উক্ত বৎসরের জেলা সমিতির কর্ম্মচারীগণ নির্ব্বাচিত হয়েছেন :—

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার, এম-এ, বি-এল, সভাপতি; বাবু দীননাথ দাস, মৌঃ আবদার রহমান প্রভৃতি সম্পাদক; জ্ঞানেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, একাউণ্টাণ্ট, ইত্যাদি।

১৩১৪ সালে শ্রীযুক্ত দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ফরিদপুর জেলা সমিতির প্রথম অধিবেশন উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত কার্য্য বিবরণীতে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতাটী প্রদত্ত হয়েছে।

(১৫) অম্বিকাচরণের মৃত্যুতে অমৃতবাজার পত্রিকা নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন :—

It is with heavy heart that we have to announce the death of the Grand Old Man of Bengal, Babu Ambika Charan Mazumder. He was one of the stalwarts of the old generation and his demise leaves a tremendous void in the ranks of our public men. The younger generation is apt to think little of the efforts and achievements of the giants of the old. But it is true that the latter have prepared the ground for those who come after them. They have been the ploughmen whose arduous duty it was to break the hard soil. If the soil has now proved fertile, it is because of the exertions of these ploughmen. Ambika Charan Mazumder was one of them. He had none of the advantages of influential connection, but on the other hand was a mofussil man and in those days leadership was not for the mofussilite, but the monopoly of the Calcutta man. But Ambika Charan's genius raised him to the position of not only a Provincial but an all-India leader. He was elected by the suffrage of united India to the presidentship of a session of the Indian National Congress. He had the gift of high intellect and was trained for hard work and nature had endowed him with a fine physique. His commanding

presence made him at once the cynosure of all eyes in great gatherings including the Congress and his masterful personality enforced reverence and obedience. We have seen people quail before his penetrating eyes. He was every inch a prince among men and one of whom the nation was justly proud. He was an intimate friend of Late Babu Motilal Ghose and was a sincere well-wisher of the "Patrika"........ One by one we are losing the great souls of the old generation who have made Bengal what it is. The year that is closing has witnessed the exit from our midst of as many as three of them,—Baikuntha Nath Sen, Motilal Ghose and Ambika Charan Mazumder. It is a terrible loss to Bengal and will take long to recoup.

(গভীর বেদনার সহিত আমরা জানাচ্ছি যে বাংলার গ্র্যাণ্ড্ ওল্ড ম্যান্ বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার আর ইহলোকে নেই। প্রাচীনদের গোষ্ঠীতে তিনি ছিলেন একজন দিক্‌পাল, তাঁর প্রয়াণে জননায়কগণের মধ্যে একটা অপূরণীয় স্থান শূন্য হোল। তরুণসমাজ অনেকসময় পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষীবৃন্দের সম্বন্ধে একটা অসম্পূর্ণ খেলো ধারণা পোষণ করে থাকেন। কিন্তু একথা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তাঁরা যে ক্ষেত্রটীকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন তার উপরেই আমরা নির্ভর করে রয়েছি। তাঁরা কঠোর শ্রমশীলতার

অনুবর্ত্তী হয়ে যে অনুর্ব্বর ভূমিটিকে কর্ষণ দ্বারা মসৃণ করে রেখেছিলেন, তার উপরেই আমরা শুধু ফসল বুনছি। তাঁদেরই একজন ছিলেন অম্বিকাচরণ মজুমদার। সামান্য মফঃস্বলে তাঁর জন্ম হয়েছিল, কোন প্রভাবশালী পরিবারের সহিত তাঁব সম্পর্ক ছিল না। আর তখনকার দিনে মফঃস্বলবাসীর পক্ষে নেতৃত্ব করার কোনরকমের সুবিধা ছিল না, কলিকাতাবাসীরাই নেতৃত্বের সকল প্রকারের রাস্তা জুড়ে বসে ছিলেন। অম্বিকাচরণের প্রতিভা তাঁকে অতি উচ্চে আরোহণ করতে ক্ষমতা দান করেছিল। তিনি শুধু একটী প্রদেশের সীমানার মধ্যে নেতৃত্বের মর্য্যাদালাভ করেন নাই, সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁকে নেতৃরূপে বরণ করে নিয়েছিল। মিলিত ভারতবর্ষের সম্মতিতে তিনি একবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি বিশিষ্ট অধিবেশনের সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ছিল তাঁর, এবং কঠোব-শ্রম তাঁর স্বভাবের অনুকূল ছিল। দেখতে অতি সুপুরুষ ছিলেন তিনি। কোন সভাসমিতিতে বিপুল জনসমাগমের সামনে যখন তাঁর মহান্ ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত, তখন তিনি সর্ব্বজনমনোহারীরূপে প্রতিভাত হতেন। তাঁর তীক্ষ্ণ চক্ষুদুটীর সম্মুখে এসে বহুলোক স্তম্ভিত হয়ে যেত। সকল মানুষেব মাঝখানে তিনি রাজপুত্রের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হতেন। তাঁর নিমিত্ত আমাদের দেশ যথার্থভাবে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করতে পারে। স্বর্গত ৺মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন তিনি এবং "পত্রিকার" একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। একে একে আমরা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মাদের সংস্পর্শ হারাচ্ছি,

অথচ এঁরাই বাংলাদেশের বর্ত্তমান স্বরূপটিকে অস্তিত্ব দিয়েছেন। যে বছরটী শেষ হতে চলেছে তার বুকের উপর দিয়ে তিনটী মহামানবের আত্মা আমাদের ছেড়ে চলে গেল। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ সেন, মতিলাল ঘোষ এবং অম্বিকাচরণ মজুমদার ইহলোকের মায়া ত্যাগ করলেন। বাংলার এ একটা অপূরণীয় ক্ষতি ; অনেক দিন লাগবে এঁদের শূন্য স্থান পূর্ণ করতে।

(Amritabazar Patrika,
December 30, 1922)

(১৬) অম্বিকাচরণের স্মৃতি অর্চ্চনা করে "বেঙ্গলী" পত্রিকা নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন :—

We are extremely grieved to learn of the death, at Faridpur, last morning, of Babu Ambica Charan Mazumder, an ex-president of the Indian National Congress. Babu Ambica Charan was one of the greatest assets of Bengali public life before his health broke down some five years ago, and he, with Babu Aswini Kumar Dutta of Barisal and Ananda Chandra Roy of Dacca, had given the drybones in the valley in Eastern Bengal a new life and a new national inspiration. These three men had brought down Lord Curzon on his knees and Sir Bampfylde Fuller to grief during the height of the agitation over the partition of Bengal.

Babu Ambika Charan, was one of the best speakers Bengal ever had and was endowed with many brilliant qualities of the head and heart. Besides being the Chairman, and one of the most efficient heads, of the Faridpur Municipality for a long number of years, and the President of the Indian Association for two terms, he also presided over a session of the Bengal Provincial Conference at Burdwan and, in 1916, guided, as president, the deliberations of the Indian National Congress at Lucknow—a fateful session which settled the Hindu—Moslem proportion of representation and on which the Government of India Act electorates are largely based. To the end of his life he stood by law and order, and was one of the stoutest advocates of constitutional development of India.

.........In the old Bengal Legislative Council, he was a tower of strength on the nationalist benches. In fact, in his death, Bengal loses one of the builders of New India.

(বাবু অম্বিকাচরণের মৃত্যুসংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হয়েছি। গত-কল্য প্রাতঃকালে ফরিদপুরের বাসস্থানে তিনি অন্তিম নিশ্বাস

ত্যাগ করেছেন। তিনি এককালে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। পাঁচ বছর যাবৎ ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে ছিলেন তিনি, এর পূর্ব্বে বাংলার গণজীবনের ক্ষেত্রে তিনি অতি উচ্চ মনীষা দেখিয়েছিলেন। বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত, ঢাকার আনন্দচন্দ্র রায় এবং তিনি পূর্ব্ববঙ্গের উপত্যকাভূমির অস্থিপঞ্জরে নতুন জাতীয় চেতনা এবং নবজীবন দান করেছিলেন। এই তিনজন মহান্ পুরুষের ক্ষমতা লর্ড কার্জ্জনকে ভারতবাসীর সামনে নতজানু হতে বাধ্য করেছিল এবং বঙ্গচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা যখন খুব বেশী অনুভূত হয়েছিল সে সময়ে ব্যাম্প্‌ফাইল্ড্ ফুলার সাহেবকে নিজের কাজের জন্য অনুতপ্ত করেছিল। এ পর্য্যন্ত যত বক্তা বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মীপুরুষ ছিলেন অম্বিকাচরণ। হৃদয় ও মস্তিষ্কের বহুবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন তিনি। বহুকাল যাবৎ ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে তিনি চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ও বিশিষ্ট কর্ম্মী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। দুই বছর (?) ধরে তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি ছিলেন। একবার (?) তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৯১৬ সালে সভাপতিপদে বৃত হয়ে লক্ষ্মৌতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন পরিচালনা করেছিলেন। এই অধিবেশনেই হিন্দু-মোস্‌লেম প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রশ্নের সমাধান হয়। ভারত শাসন-তন্ত্রের আইন অনুসারেও এই সমাধানের বিশেষ অদলবদল হয় নাই। জীবনের শেষক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নিয়মশৃঙ্খলার পক্ষপাতী ছিলেন এবং ভারতবর্ষের নিয়মতান্ত্রিক পরিণতিতে তিনি অতিরিক্ত আস্থা পোষণ

করতেন।……পূর্ব্বতন বঙ্গীয় আইনসভায় জাতীয় দলের একটী শক্তি-শালী অগ্রণী নেতা ছিলেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মৃত্যুতে আধুনিক ভারতের নির্ম্মাণকর্ত্তাদের অন্যতমকে আমরা হারিয়েছি।

(Bengalee, Saturday,
December 30, 1922)

(১৭) অম্বিকাচরণ একাদিক্রমে চারি বৎসর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি পদে আরূঢ় ছিলেন, ১৯১৩ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত।

১৯১৩ সালে অম্বিকাচরণ ভারতসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই বৎসর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনরারী সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি সহসভাপতির স্থান পূর্ণ করেছিলেন। (P. 1, The Annual Report of the Indian Association for the year 1912.)

১৯১৪ সালে ভারতসভার সভাপতি পদে অম্বিকাচরণ, সহ-সভাপতির পদে রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, এ, রসুল প্রভৃতি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯১৩ সালে ভারতসভার পক্ষ হতে অম্বিকাচরণ, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভাইসরয়ের কাছে ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন। (P. 39, Report of the Indian Association for the year 1913.)

১৯১৫ সালে ভারতসভার সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করেন অম্বিকাচরণ এবং কার্য্যকরী সমিতিতে ছিলেন নীলরতন সরকার, রাসবিহারী ঘোষ, কৃষ্ণদাস রায় প্রভৃতি।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দেও অম্বিকাচরণ এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং কার্য্যকরী সমিতিতে ব্যারিষ্টার এস, আর, দাস ; নিবারণ-চন্দ্র রায় প্রভৃতি ছিলেন।

১৯১৫ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ৬২নং বহুবাজারে স্থিত বর্ত্তমান আবাসগৃহটীর দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উৎসবের প্রধান পুরোহিত ছিলেন অম্বিকাচরণ। এই সভায় পি, সি, রায়, দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। গৃহটী বিজলীবাতি ও উজ্জ্বল আলোকমালায় সজ্জিত হয়েছিল। গৃহের রূপসজ্জাও বিশেষ প্রীতিপ্রদ হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ অম্বিকাচরণকে ভারত-সভাগৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করতে অনুরোধ করে একটী বক্তৃতা করেন। সভাপতি বাবু অম্বিকাচরণ অতঃপর বক্তৃতা করেন। তিনি ভারতসভার সভ্যগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে উপদেশ দেন এবং অবিরত রাজনৈতিক প্রচারকার্য্য চালাতে অনুরোধ করেন। সামান্য জল-যোগান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। (P p. 23-30, Report of the Indian Association for the year 1915.)

অম্বিকাচরণ ১৯১৭, ১৯১৮ and ১৯১৯ সালে ভারতসভার কার্য্য-করী সমিতির সভ্য ছিলেন।

(১৮) অম্বিকাচরণ অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন। কারু সামান্য ক্রটী বিচ্যুতি সহ্য করতে পারতেন না। ঘরে এবং বাহিরে সকলেই তাঁকে ভয় করে চলত। এমন কি তাঁর স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তাঁর সঙ্গে মিশতে সাহস করতেন না। মেয়েরা তাঁর কাছে ছিলো অন্তঃপুর-চারিকার স্থলভুক্ত। তাদের স্বাধীন সত্তাকে তিনি স্বীকার করতেন

না। এ দিক দিয়ে তিনি ভয়ানক গোঁড়া ছিলেন। তাঁর ছেলেরা তাঁর কাছে ঘেঁষতে সাহস করতেন না। তিনি বহির্ব্বাটীতে বর্ত্তমান থাকলে ছেলেরা ভিতরে খিরকি দরজা দিয়ে বাটীতে প্রবেশ করত। তাঁর কথার উপরে কেউ একটী কথা বললে তাঁব মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠত। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি যেমন স্বীয় গুরু সুরেন্দ্রনাথের নিকটে সর্ব্বদা শির নত করে থাকতেন, তেমনি আবার তাঁর নিম্নতন রাজনৈতিক কর্ম্মীগণ তাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করুক এও তিনি চাইতেন না। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক মনোভাব তাঁর ছিল না। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক। সেইকারণেই কুলিশ-কঠোর এবং কুসুম-কোমল এই দ্বিবিধ প্রকৃতির সমাবেশ হয়েছিল তাঁর চরিত্রে।

তাঁর সম্বন্ধে একটি ঘটনা উপলক্ষ্য করে অনেকে বিরুদ্ধভাব পোষণ করে থাকেন। তাঁর সেজদাদা পার্ব্বতীচরণের কথা গ্রন্থে বর্ণিত হযেছে। কোন কারণে পার্ব্বতীচরণের আততায়ীর হস্তে মৃত্যু হয়। তাঁর এই অপমৃত্যুকে নানারঙে সাজিয়ে কেহ কেহ প্রচার করেছিলেন। সম্পূর্ণ ঘটনাটি ভালো করে নিরীক্ষণ করলে কারু পক্ষে এরূপ অসঙ্গত অনুমান করা সম্ভব হোত না। অম্বিকাচরণ সামন্ততন্ত্রের পূজারী হলেও তাঁর স্বভাবে জায়গীরদারী মনোভাবেব সুষ্ঠু ও সুন্দর দিকটাই অধিকতর উজ্জলরূপে বিকশিত হয়েছিল। তিনি অতি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ভ্রাতৃবিরোধের মূল কারণস্বরূপ তিনি না হলেও তাঁর অকুণ্ঠ সততাই এই বিরোধকে ইন্ধন দিয়েছে। তিনি যেমন ছিলেন উদারতার মহিমায় মণ্ডিত, তাঁর বিপক্ষ আত্মীয় স্বজন এই সুযোগ গ্রহণ করে তাঁর পিছনে ঈর্ষা ও কুৎসার অসি উত্তোলন করে তাঁকে পর্যাদস্ত করতে সর্ব্বদা

চেষ্টা করেছে। ঐশ্বর্য্য যাঁর পায়ের তলায় নতজানু লক্ষ্মীর মত অনাহূতরূপে এসেছিল, যিনি বৃহত্তর মানব সমাজে নিজের বিভব-গরিমাকে ছড়িয়ে দিয়ে আনন্দ পেয়েছেন, তিনি সামান্য ভূমিখণ্ডের নিমিত্ত পশু-সুলভ হীনবৃত্তির সেবা করেছেন এ মনে করার কোন সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজে পাই না।

সমাপ্ত